লাল বর্ণের গদ্য

জিহাদ

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন অনূদিত

লাল বর্ণের গদ্য

জি হা দ

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
অনুদিত

এদারায়ে কুরআন
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বারুদের গন্ধে যাঁরা খুঁজে পায়
বেহেশতের দীপ্ত আহ্‌বান
তাঁদের হাতে ॥

আমার নিবেদন

জিহাদ প্রিয়তম রাসূল (সা.) এর আলোকময় উত্তরাধিকার। উম্মাহ্ যত দিন পর্যন্ত এই উত্তরাধিকারের সযত্ন লালন করেছে, চর্চা করেছে, বুকের তাজা রক্ত দিয়ে রচনা করেছে ইসলাম ও আযাদীর নতুন নতুন মানচিত্র– ততদিন তাঁরা পৃথিবীময় রাজত্ব করেছে; সারা পৃথিবী তাদের গোলামী করেছে আর তারা গোলামী করেছে কেবল আল্লাহর। অবশেষে তারা যখন তলোয়ার নামিয়ে রেখেছে, আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে– তারা গোলামে পরিণত হয়েছে সারা জাহানের। তারা এখন অর্থের গোলাম, অস্ত্রের গোলাম, শিল্পের গোলাম, গোলাম নিজের অন্ধ নফসের ; গোলাম বিশ্ব মোড়ল কসাই বেঈমানদের।

সেই গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ আজ আমাদের কিবলা বাইতুল মুকাদ্দাস, বন্দী আফগান কাশ্মিরসহ অসহায় যত মুসলিম জনপদ। আমাদের এই নিবেদন, সেই গোলামীর জিঞ্জির ছিঁড়ে নতুন করে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াবার এক মুক্ত আহবান। আমাদের তারুণ্যে, চিন্তায়-দর্শণে সে আহবান কতটা সাড়া জাগাবে– সেটাই এখন অপেক্ষার বিষয়।

আল্লাহর দরবারে বলি, হে আল্লাহ!

তুমি আমাদেরকে এই যিল্লতির জীবন থেকে মুক্তি দাও! তোমার পথে সংগ্রাম করার মত ঈমান দাও আর বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর মেরুদণ্ডগুলো সোজা করে দাও; মুসলিম মিল্লাতের প্রতিটি সদস্যকে জযবা দাও তোমার পথে জীবন বিলাবার। আমীন!!

নিবীত

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

সূচি

লাল বর্ণের গদ্য ঃ জি হা দ
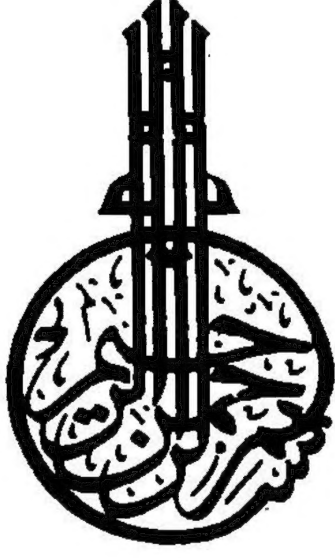
মুজাহিদের চিঠি

গাযী আনওয়ার পাশা শহীদ (রহ.)

তুরস্কে মুসলমানদের স্বাধীনতা ও ইসলামের আদর্শ রক্ষায় যিনি রনাঙ্গণে শাহাদাত বরণ করেন॥

[জিহাদ মানে জীবন! অনন্ত শান্তির পথ! যাঁরা আল্লাহর পথে জীবন দিয়ে শাহাদাতের সুধা পানে ধন্য হোন বেহেশ্‌তের দরোজা তাদের জন্য খোলা। মানব ইতিহাসে অমর হয়ে থাকেন তাঁরা। আর অনন্ত শান্তির অসীম সুখের ঠিকানা জান্নাতে লেখা হয়ে যায় তাঁদের নাম। তাই এই অনন্ত সুখের যাঁরা সন্ধান পান, বুকের তপ্ত রক্ত ঢেলে দিয়ে বেহেশতের আলোকিত ফলকে নিজেদের নাম অংকিত করে নিতে এক বিন্দু পিছপা হোন না তাঁরা; বরং পার্থিব শত মমতার জাল ছিন্ন করে পরম পারঙ্গমতায় ঝাঁপিয়ে পড়েন আল্লাহর রাহের সংগ্রামে। এ পথেরই এক অমর নাম গাযী আনওয়ার পাশা!

পৃথিবীর ইতিহাসে যুগে যুগে যাঁরা আল্লাহর দীনকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্নে আমরণ জিহাদ করে গেছেন গাযী আনওয়ার পাশা তাঁদের-ই অন্যতম একজন। আল্লাহর রাহের এক সফলতম শহীদ যোদ্ধা। রুশ বেইমানদের বিরুদ্ধে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যিনি সংগ্রাম করে গেছেন ইসলাম ও তুর্কী মুসলমানদের পক্ষে। শাহাদাতের মাত্র একদিন পূর্বে তিনি তাঁর প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনীর নামে একটি চিঠি লিখেন। জীবনবন্ধু শাহ্‌জাদী নাজিয়্যা সুলতানার নামে লেখা এই চিঠিটি বিশ্বের

সকল তরুণ মুসলিমদের জন্যই সমান আবেদনময়! বিশেষ করে আজ যখন মুসলিম নামের লা-ওয়ারিশ মিল্লাত নিয়ে পশু-খেলা খেলছে বিশ্বের তাবৎ হায়েনার দল। যখন মরছে মা, শিশু ও অসহায় বোনেরা! জ্বলছে মুসলমানের বাড়ি-ঘর ইবাদতখানা! লুণ্ঠিত হচ্ছে মায়েদের ইজ্জত! শকুনীদের কালোপাঞ্জা খুবলে খাচ্ছে আমাদেরই বোনদের চিরপবিত্র সম্ভ্রম! অবরুদ্ধ যখন আমাদের কিবলা ঘর! ইথারের পাতা ভারী হয়ে পড়েছে যখন বেইমানদের ঘোষিত সন্ত্রাসী জঙ্গ-দামামায়, তখন মিল্লাতের দামাল ছেলেরা ঘুমুচ্ছে মধুর ঘুম। তাদের নিদ্রা ভাঙ্গাতে প্রয়োজন আন্‌ওয়ার পাশার চিঠিটি নতুন করে পাঠ করা! এই উদ্দেশ্যেই আমরা চিঠিটির অনুবাদ এখানে পত্রস্থ করলাম। অনুবাদক ॥]

আমার জীবন সঙ্গিনী
আমার সুখ ও স্বপ্নের ঠিকানা
প্রিয়তমা নাজিয়্যা!

পরম সম্মানিত মহান আল্লাহ্ তোমার সহায়।

এখন আমার সামনে তোমার সর্বশেষ চিঠিটি! আমার চোখের সামনে! তুমি বিশ্বাস কর, তোমার এই চিঠি আমার বুকের সাথে মিশে থাকবে আজীবন। আজ আমি তোমার মুখচ্ছবি দেখতে পাই না। কিন্তু চিঠিটি যখন পড়ি মনে হয় বর্ণমালার কাতারে কাতারে শব্দে শব্দে তোমার আঙ্গুলগুলো নড়াচড়া করছে, যে আঙ্গুলগুলো এক সময় আমার মাথার এলোকেশ নিয়ে খেলা করত। তাঁবুঘেরা এই মেঘলা পরিবেশেও ক্ষণে ক্ষণে চোখের সামনে ভেসে উঠছে তোমার প্রিয় মুখ।

আহ্! তুমি লিখেছ, আমি তোমাকে ভুলে গিয়েছি! তোমার ভালবাসার কোন মূল্য নেই আমার কাছে। তুমি বলেছ, আমি তোমার প্রেমভরা হৃদয়কে ভেঙ্গে দিয়ে এই দূর দেশে আগুন আর রক্ত নিয়ে খেলা করছি! আর আমি এইটুকু ভেবে দেখি না, আমার বিচ্ছেদে এক অবলা নারী আকাশের তারকা গণনা করে রাত কাটায়।

তুমি লিখেছ, আমি লড়াইকে ভালবাসি, তলোয়ারের সাথে আমার প্রেম! অথচ একথা লেখার সময় তুমি ভেবে দেখনি– যদিও এটা তোমার সত্য ভালবাসার তাড়নায়ই লিখেছ– তোমার একথা আমার হৃদয়কে খুন করে ফেলবে। বল, আমি তোমাকে কি করে বোঝাই, এই পৃথিবীতে তোমার ভালবাসাই আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তোমার মহব্বতই আমার সকল প্রেমের চূড়া।

আমি ইতিপূর্বে কাউকে ভালবাসিনি, কিন্তু তুমিই একমাত্র প্রিয়া– যে আমার হৃদয় ছিনিয়ে নিয়েছে।

বল, কী করে আমি তোমা' থেকে আলাদা হব!

হৃদয়ের শান্তি আমার! তোমার এ প্রশ্ন অবশ্যই যথার্থ। তবে শোন, কী জন্য তোমার থেকে এত দূরে পড়ে আছি! আমি কোন অর্থ–সম্পদের আশায় তো এই ভিন্‌দেশে আসিনি! তাছাড়া আমি যে আজ নিজের জন্যে কোন সিংহাসন নির্মাণ করছি– তাও তো নয়! অবশ্য আমার শত্রুরা লোকমাঝে একথাই ছড়িয়ে দিয়েছে!

প্রিয়তমা!

আমি তোমাকে ছেড়ে শুধু এই কারণেই এখানে পড়ে আছি, 'আল্লাহর দেয়া ফরয' আমাকে এখানে টেনে এনেছে। আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে বড় দায়িত্ব আর কী আছে বল? এবং এই সেই কর্তব্য, যা আদায় করে মানুষ 'জান্নাতুল ফিরদাউস'–এর মালিক হতে পারে। 'আল-হামদু লিল্লাহ' আমি শুধু এর নিয়তই রাখি না; বরং বাস্তবে এই কর্তব্য আদায় করছি এখন।

তোমার বিয়োগ-যন্ত্রণা শাণিত তলোয়ারের মতো হৃদয়কে আমার প্রতিটি ক্ষণে রক্তভেজা করে। অথচ বিয়োগ যন্ত্রণাতেও আমি খুশি, অত্যন্ত তৃপ্ত। কারণ তোমার ভালবাসাই এখন আমার জন্যে সবচে' বড় পরীক্ষা। মহান প্রভুর অযুত লক্ষ শোক্‌র, আমি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছি। আল্লাহর প্রতি ভালবাসা আর তাঁর নির্দেশকে আমি আমার প্রেম ও মনের উপর প্রাধান্য দিতে পেরেছি। এবং সফলভাবেই পেরেছি। তোমাকেও খুশি হওয়া উচিত এবং আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করা উচিত এই কারণে, তোমার জীবনসঙ্গীটির ইমান এত দৃঢ় ও মজবুত যে, তোমার ভালবাসাকে পর্যন্ত বলি দিতে পেরেছে আল্লাহর ভালবাসাকে রক্ষা করতে গিয়ে।

তোমার ওপর তলোয়ারের যুদ্ধ ফরয নয়। তাই বলে তোমার ওপর জিহাদ ফরয নয়– এমনটি ভাবার কোন সুযোগ নেই! মুসলমান নারী-পুরুষ সকলের ওপরই জিহাদ ফরয। তোমার জিহাদ হলো, তোমার প্রেম ও মনের ওপর আল্লাহর ভালবাসাকে প্রাধান্য দেবে। স্বীয় স্বামীর সাথে প্রকৃত সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে।

মনে রেখো, কখনো এই দুআ করবে না–তোমার স্বামী সহী-সালামতে তোমার কোলে ফিরে আসুক, তোমার ভালবাসার ছায়ায় এসে আশ্রয় নিক।

কারণ, এটা তো একান্তই স্বার্থান্বেষী দুআ। এই দুআ আল্লাহর দরবারে আদৌ পছন্দনীয় নয়; বরং এই দুআ করবে–যেন আল্লাহ তাআলা তোমার স্বামীর জিহাদকে কবুল করেন। যেন বিজয় দান করেন অথবা শাহাদাতের পেয়ালা তার ঠোঁটের স্পর্শে তুলে দেন। হ্যাঁ, তুমি তো জান, সেই ঠোঁট, যা কখনো শরাবের স্পর্শে অপবিত্র হয়নি বরং সর্বদাই আল্লাহর কালামের তিলাওয়াত ও যিকরে মশগুল ছিল।

প্রিয়তমা নাজিয়্যা,

আহ্! একবার ভেবে দেখ, তোমার স্বামীর যে মস্তকটিকে তুমি অতি সুন্দর বলে প্রশংসা করতে সেই মস্তকটিই যখন আল্লাহর পথে তার শরীর থেকে আলাদা করা হবে–সেটা কতই না বরকতময় মুহূর্ত। তোমার স্বামীর সেই বদন–তোমার ভালবাসার দৃষ্টিতে কোন সৈন্যের শরীরের মত মনে হতো না, মনে হতো কোমল ও লাবণ্যময়ী নারী দেহের মতো ---। আজ আমার সবচে' বড় স্বপ্ন এটাই, আমি যেন শহীদ হতে পারি, আমার হাশর যেন খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.)-এর সাথে হয়। এই পার্থিব জীবন তো মাত্র কয়েক দিনের। মৃত্যু অনিবার্য। তারপরও মৃত্যুর ভয় কিসের?

আর মরবোই যখন, তখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে মরব কেন? শাহাদাতের মৃত্যু! সে তো মৃত্যু নয়– জীবন! অনন্ত জীবন!!

নাজিয়্যা!

আমার অসিয়ত শোন! যদি আমি শহীদ হয়ে যাই তাহলে তুমি তোমার দেবর নূরী পাশাকে বিয়ে করে ফেল। তোমার পরে নূরীই আমার সবচে' প্রিয়। আমি কামনা করি, আমি পরপারে চলে যাবার পর নূরী আজীবন তোমার সেবা করুক, তোমার হক আদায় করুক।

আমার দ্বিতীয় অসিয়ত হলো, তোমার গর্ভে যত সন্তান হবে সকলকেই আমার জীবন সম্পর্কে অবগত করবে; আমার জীবন কাহিনী শোনাবে! এবং সকলকেই ইসলাম ও স্বীয় জাতির খেদমতে জিহাদের ময়দানে পাঠাবে। যদি আমার এই অসিয়ত রক্ষা না কর তাহলে মনে রেখ– বেহেশতে গিয়েও আমি তোমার সাথে রাগ করব।

আমার তৃতীয় অসিয়ত হলো, সর্বদাই মোস্তফা কামাল পাশার কল্যাণ কামনা করবে। সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা করবে। কারণ, এই মুহূর্তে দেশ ও জাতির মুক্তি আল্লাহ পাক তার হাতেই রেখেছেন। *১

প্রিয়তমা !

এখানেই বিদায়! জানিনা, আমার মন কেন যেন বলছে, এরপর আর তোমাকে কখনো চিঠি লেখা হবে না। আশ্চর্যের কি আছে, কালই শহীদ হয়ে যেতে পারি! দেখ, তুমি কিন্তু ভেঙ্গে পড়ো না! ধৈর্য ধরো! আমার শাহাদাতের সংবাদে চিন্তিত-ব্যথিত না হয়ে বরং খুশি হয়ো। কারণ, আমি যদি আল্লাহর পথে কাজে লাগতে পারি তাহলে এটা তোমার জন্যও গর্বের বিষয়।

নাজিয়্যা !

এবার বিদায় নিচ্ছি। আর কল্পনার রাজ্যে তোমার সাথে আলিঙ্গন করছি। ইনশাআল্লাহ বেহেশতে দেখা হবে এবং তারপর আর পৃথক হবো না।

—তোমার আনওয়ার

**১. স্মরণ রাখতে হবে, আনওয়ার পাশা যখন এই চিঠি লিখছেন তখন পর্যন্ত মোস্তাফা কামাল পাশা প্রসিদ্ধ ছিলেন একজন মুজাহিদে ইসলাম হিসোব। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তুর্কিস্তানে তিনি যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করার কারণে ইতিহাসে আজও বিতর্কিত ও নিন্দিত সেসব ঘটনার অবতারণা তখনও ঘটেনি। [সূত্র ঃ তারাশে, মাওলানা তকী উসমানী, ৯৮ পৃ]*

জিহাদ সর্বোত্তম নেক আমল

শহীদ ডক্টর আবদুল্লাহ আযযাম (রহ.)

উসামা বিন লাদেনের গুরু এবং বিশ্বব্যাপি সমকালীন মুজাহিদদের প্রেরনার উৎস-পুরুষ।

পবিত্র কুরআন ও রাসূলে কারীম (সা.)-এর হাদীসের আলোকে এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত, জিহাদই সর্বোৎকৃষ্ট নেক আমল। মুজাহিদের আমলের সমতুল্য আর কোন নেক আমল নেই। বিখ্যাত সাহাবী হযরত নু'মান ইবন্ বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদিন আমি হযতর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মিম্বরের কাছে বসা ছিলাম। সেদিন ছিল জুমুআ বার। (কথা হচ্ছিল আল্লাহর রাসূলের সাহাবীদের মধ্যে।) তখন এক সাহাবী বললেন ঃ আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিই হাজীদের পানি পান করানোর বিষয়টিকে। আমার মতে এরচে' ভাল আর কোন নেক আমল নেই। তখন আরেকজন সাহাবী বললেন আমার দৃষ্টিতে হেরম শরীফের মসজিদকে আবাদ করার চেয়ে উত্তম কোন আমল নেই। তৃতীয়জন এই দুজনের কথার জবাবে বললেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদ করাই সর্বোত্তম আমল। (আলোচনা যখন একটু তপ্ত হয়ে উঠল তখন) হযরত উমর (রা.) ধমকের সুরে বললেন ঃ শোন, নবীজীর (সা.) মিম্বরের পাশে বসে হৈচৈ করো না! তারপর যখন জুমুআর নামায শেষ হলো তখন হযরত (সা.)-এর খেদমতে গিয়ে আমরা আলোচ্য বিষয়টি উত্থাপন করলাম। আর তখনই এই আয়াত অবতীর্ণ হলো—

"তোমরা হাজীদের পানি পান করানো আর মসজিদে হারামকে আবাদ করাকে ঐ ব্যক্তির সমতুল্য করে দিলে, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামতের প্রতি ঈমান এনেছে আর জিহাদ করেছে আল্লাহর পথে। এটা আল্লাহর দরবারে সমতুল্য নয়।" *[মুসলিম শরীফ. ২য় খণ্ড, ১৩৪ পৃ.]*

মুসনাদে আবদুর রাযযাকের একটি বর্ণনায় আছে, হযরত আব্বাস (রা.) মুসলমান হয়েছেন। গল্প হচ্ছে হযরত তালহা ইব্‌ন শাইবা, হযরত আব্বাস ও হযরত আলী (রা.)-এর মধ্যে। কথাবার্তার এক পর্যায়ে হযরত তালহা (রা.) বললেন ঃ দেখ, আমি এমন একটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী যা তোমরা কেউ অর্জন করতে পারনি। কারণ, বাইতুল্লাহর চাবি আমার হাতে। আমি ইচ্ছা করলে বাইতুতুল্লাহর ভেতরে গিয়ে রাত কাটাতে পারি। হযরত আব্বাস (রা.) বললেন ঃ হাজীদেরকে পানি পান করানোর দায়িত্বে আছি আমি। তাছাড়া হেরেম শরীফের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও আমার হাতে। হযরত আলী (রা.) বললেন ঃ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনারা কী নিয়ে যে গর্ব করছেন! কারণ, আমার অবস্থা হলো, আমি সকলের পূর্বে বাইতুল্লাহমুখী হয়ে ছয় মাস নামায আদায় করেছি এবং তারপর আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে আল্লাহর পথে জিহাদ করে যাচ্ছি! এই ঘটনার পরই উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়– যাতে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠছে ঈমানের পর সর্বোত্তম নেক আমল হলো আল্লাহর পথে জিহাদ।

বুখারী শরীফের বর্ণনার আছে, হযরত রাসূলে কারীম (সা.) ইরশাদ করেন ঃ শবে কদরে হাজরে আসওয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে রাতভর নামায পড়ার চেয়ে আল্লাহর পথে সীমান্ত পাহারা দেয়াটাকে আমি অধিক পছন্দ করি। [বুখারী]

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন ঃ কদরের রাতে হাজরে আসওয়াদের সামনে আমার দু'আ কবুল হওয়ার চেয়ে আল্লাহর পথে সীমান্ত পাহারা দেয়াকে আমি বেশী পছন্দ করি!

জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও বুযুর্গ হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক (রহঃ) যখন তারসূম সীমান্তে প্রহরীর ভূমিকায় বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছেন তখন হযরত ফুযাইল ইবন আয়ায (রহঃ)সহ আরও অনেক ওলী-দরবেশ হারামাইন শরীফাইনে আল্লাহ'র বন্দেগীতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তখন হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক (রহঃ) হযরত ফুযাইল ইব্‌ন আয়ায (রহঃ) ও অন্য তাপসদের উদ্দেশে একটি কবিতা লিখে পাঠান। যা ছিল নিম্নরূপ—

"হে হারামাইনের আকণ্ঠ নিমগ্ন তাপস!
তুমি যদি একবার আমাদেরকে দেখতে,
তাহলে বুঝতে, ডুবে আছ তুমি ইবাদতের বালখিল্যতায়।
সেতো সিক্ত করেছে গ্রীবা তার নয়ন আঁসূতে–
আর আমরা রাঙিয়েছে বাহুদেশ মোদের
আমাদেরই তপ্ত খুনে।
অলক্ষ্যে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত যদি অশ্ব তাদের
আমরা হাঁকিয়েছি আমাদের ঘোড়া লড়াইয়ের ময়দানে!
আম্বরের সুরভি সেতো তোমাদেরই মানায়
আমাদের সুরভি পবিত্র ধুলোবালি
ঘোড়ার খুরের কঠিন আঘাতে যা নিয়ত উড়ে আসে ॥'

কবিতাগুলো হযরত ফুযাইল (রহঃ)-এর হাতে পৌঁছলে তিনি তা গভীর মনযোগসহ পাঠ করেন। তাঁর চোখ ভরে ওঠে অশ্রুবন্যায়। বলে ওঠেন– সত্য বলেছেন আবূ আবদুর রহমান আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক! এবং এগুলো আমার জন্য অনেক বড় উপদেশ! *[আল- জিহাদ লি-ইবনিল মুবারক]*

হযরত ফুযাইল ইবন যিয়াদ (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ এক বার এক ব্যক্তি হযরত ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হামবাল (রহঃ)-এর দরবারে জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা তুলল। জিহাদের আলোচনা উঠতেই হযরত ইমাম আহমাদ (রহঃ) কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং বললেন ঃ এই পৃথিবীতে জিহাদের চেয়ে উত্তম আর কোন আমল নেই। তিনি এও বলেছেন ঃ শত্রুর মোকাবিলা করার চেয়ে উত্তম আর কোন আমল নেই! জিহাদের ময়দানে শত্রুর মোকাবিলায় যে ব্যক্তি সংগ্রামরত সে তো ইসলাম এবং ইসলামী পরিবারের সংরক্ষণে নিয়োজিত। সুতরাং এর চেয়ে উত্তম কোন আমল কীভাবে হবে?

[আল- মুগনি মাআশ- শারহিল কাবীর, ১/৩৬৮]

সর্বোত্তম ব্যক্তি আল্লাহর পথের মুজাহিদ

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত রাসূলে কারীম (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ হে রাসূল! সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? রাসূল (সা.) ইরশাদ করলেন ঃ 'সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই যে তার জান-মালসহ আল্লাহর পথে জিহাদ করে।' তারপর বললেন ঃ অতঃপর

সেই মুমিন যে নষ্ট লোকদের সংস্পর্শ ছেড়ে দিয়ে কোন নির্জন স্থানে বসে আপন প্রভুর ইবাদতে মশগুল থাকে। *[মুসলিম শরীফ, ২/১৩৬]*

এই হাদীসে হযরত রাসূলে কারীম (সা.) মুজাহিদ ও নির্জনবাসী মুমিনের মধ্যকার একটি মিলের প্রতিও সূক্ষ্মভাবে ইংগিত করেছেন। আর তাহলো, এঁদের উভয়ের চোখেই পার্থিব এই জগৎ, জগতের সম্পদ ও প্রাচুর্যের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ পরকালীন মুক্তি ও সফলতার প্রতি।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) মুজাহিদ ও আবিদ সম্পর্কে খুবই চমৎকার মন্তব্য করেছেন। বলেছেন ঃ মুজাহিদ নিজের জীবনটা হাতের মুঠোয় নিয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হয়, আর আবিদ এই পৃথিবীতে থেকেই স্বীয় কামনা-বাসনাকে পরাজিত করে। *[তাহ্যীবু মাদারিজিস-সালিকীন, ৮৩ পৃ.]*

'রনাঙ্গন' মুজাহিদের জন্য এক জলসমুদ্র। মুজাহিদ যার জন্য মাছ স্বরূপ। তার প্রাণ হলো আল্লাহ'র পথে যুদ্ধ। একবার আমার সাথে আফগানিস্তানের এক মুজাহিদের সাক্ষাৎ হলো। নাম তার রফীউল্লাহ্। সে পেশাওয়ার এসেছিল কোন এক প্রয়োজনে। তার তিন পুত্র এবং অন্য ভাইয়েরা এর আগেই রণাঙ্গনে শাহাদাত বরণ করেছেন। এবং তার শরীরেও আটটি গভীর ক্ষত আছে। অথচ তারপরও সে দুই দিনের বেশি পেশাওয়ার অবস্থান করতে পারেনি। দুই দিন কোনক্রমে কাটিয়ে আবার ছুটে গেছে রণাঙ্গনে। মূলত এটাই মুজাহিদের প্রতিকৃতি। তার কণ্ঠ সদা আপ্লুত থাকে জিহাদের কথকথায়, হৃদয় মন সদা নিবেদিত থাকে শাহাদাতের অসীম কামনায়। হাতের মুঠোয় জীবনটা ভরে বসে থাকে শরীরের রক্তগুলো আল্লাহর পথে ঢেলে দিয়ে বেহেশ্তে নিজের আসন নির্মাণের স্বপ্নে এবং এই পার্থিব জগতে মুস্লিম উম্মাহ ও স্বীয় মাতৃভূমির মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অগণিত আকাংখায়।

মহান দয়াময় আল্লাহ বলেছেন ঃ "আর তোমাদের কি হলো, তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছো না– অথচ অসহায় দুর্বল পুরুষ-নারী ও শিশুরা বলছে ঃ ওগো আমাদের মালিক! এই অত্যাচারীদের এলাকা থেকে আমাদের নিষ্কৃতি দাও! তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী অভিভাবক পাঠাও!" *[নিসা ঃ ৭৫]*

হযরত শাহ্ আবদুল কাদির দেহলভী (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ এতে প্রতীয়মাণ হয় দুই কারণে তোমাদের ওপর জিহাদ করা জরুরি।

১. আল্লাহ'র দীনকে বুলন্দ ও সমুন্নত করার লক্ষ্যে। ২. কাফেরদের হাতে নির্যাতিত অসহায় মুসলমানদের মুক্তির লক্ষ্যে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ উন্নত-উৎকৃষ্ট জীবনের অধিকারী সেই, যে আল্লাহর পথে অশ্ব চালনায় ব্যস্ত। যখনই তাকে কোন ভয়, ত্রাস কিংবা ভয়ংকর আওয়াজ এসে আঘাত করে তখনই সে স্বীয় ঘোড়ায় চড়ে মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাবতে আল্লাহর পথে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, রণাঙ্গনে নেমে আসে। *[মুসলিম শরীফ. ২/১৩৬]*

সুবিখ্যাত যোদ্ধা সাহাবী হযরত খালিদ ইব্ন ওলীদ (রা.)-এর মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসে তখন তিনি আবেগঘন কণ্ঠে উচ্চারণ করেন—

'আমার সারাজীবনের স্বপ্ন ও তামান্না ছিল—'আল্লাহর পথে শহীদ হবো।' কিন্তু আমার ভাগ্যে ছিল বিছানায় পড়ে মরণ। আমি যে দিন মুসলমান হয়েছি সেদিন থেকে আমি সর্বদাই কামনা করতাম—অশ্বারোহী অবস্থায় রাতভর উদ্যম উত্তেজনা ও অস্থিরতার মধ্যে প্রহর গুনব (এবং আকাশ আমাকে যুদ্ধের পয়গাম শোনাবে আর) প্রভাতকালে বেঈমান কাফেরদের ওপর হামলা করব।

[আল-জিহাদ লি-ইবনিল মুবারক, ৮৮ পৃ.]

আমাদের পূর্বসূরিদের ইতিহাস, সংগ্রাম ও বিপ্লবমুখর ইতিহাস। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসম সংঘাত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শানে আমোদিত আলোকিত সেই ইতিহাস। তাঁদের সেই সংগ্রামদীপ্ত অবদান আমাদের জীবন চলার পথ। বিশিষ্ট সাহাবী মাজ্যাআতুবনুদ-দাওস (রা.)-এর ঘটনা। এক যুদ্ধে তিনি নিজ হাতে একশ' কাফেরকে হত্যা করেছেন। সুবিখ্যাত সাহাবী হযরত বারা ইব্ন মালিক (রা.) এক যুদ্ধে নিরানব্বইজন বেঈমানকে স্বহস্তে জাহান্নামে পাঠিয়েছেন। কুখ্যাত কাফির মারযাবানের সাথে তাঁর লড়াই হলে তাকে তিনি কুপোকাত করে যে গনীমতের সম্পদ লাভ করেন তার পরিমাণ ছিল ত্রিশ হাজার মুদ্রা।

[আল- মুগনি মাআশ-শারহিল কাবীর, ১ম খন্ড ৩৯৪ পৃ.]

অত পেছনে যাবার প্রয়োজন নেই। আমার সাথে এক আফগান যোদ্ধার সাক্ষাৎ হয়েছে, যাঁর বয়স বাইশ-তেইশ বছরের বেশি নয়। কথা প্রসঙ্গে সে আমাকে বলল ঃ কাবুলের মধ্য অঞ্চলে আমার হাতে আমি ছুরি দ্বারা উনত্রিশজন কমিউনিস্ট গাদ্দারকে হত্যা করেছি। তাঁর সঙ্গী মুজাহিদগণও তাঁর কথার সত্যতা স্বীকার করলেন।

সীমান্ত প্রহরীদের পুরস্কার

সীমান্ত প্রহরী প্রকৃত অর্থে আল্লাহ'র পথের মুজাহিদ, যে শুধু রাত জেগে স্বীয় দেশ ও জাতির জান-মালই সংরক্ষণ করে না। সেই সাথে শত্রু পক্ষকে সন্ত্রস্ত করে, সুমন্নত রাখে জিহাদের পতাকাকে। মুসলিম জাতির নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ ও বিপজ্জনক দায়িত্বকে কাঁধে তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে স্বীয় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। অতকির্ত হামলার মুখোমুখি হয় বার বার। নিজের সুখের ঘুম বিলিয়ে দিয়ে জাতিকে ঘুমুতে দেয় মধুর ঘুম। পৃথিবী যখন পুষ্প নিদ্রায় বিভোর তাদের হৃদয়-প্রাণ তখন বারবার শিহরিত হয় শত্রুপক্ষের গুলির ভয়ংকর গর্জনে। প্রতিবাদে তারাও গর্জে ওঠে 'আল্লাহু আকবার' এর স্লোগান তুলে।

একবার আমি সুলাইমান পর্বতের নিকটে কূহে সাফীদ বা শুভ্র পর্বতের কাছে আফগান মুজাহিদদের সাথে রাত কাটাবার সুযোগ পাই। রাতের কিয়দাংশ পার হবার পর মুজাহিদগণ আমাদের জাগিয়ে তুললেন। আমি ঘুম থেকে উঠে বিমানবিধ্বংসী তোপের চলন-ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম। ভীষণ ভয় হচ্ছিল আমার। আমার অস্ত্রটি খুঁজছিলাম আমি। তখন হঠাৎ এক যুবক মুজাহিদ আমাদের তাঁবুতে ঢুকে পড়ল এবং আমাদের সান্ত্বনা দিতে লাগল। আমি তখন তার পোশাকের দিকে তাকিয়ে দেখি, ময়লা-ছেঁড়া কাপড়। তার চোখে-মুখে ক্ষুধা তৃষ্ণার বর্ণমালাগুলো জ্বলজ্বল করছে। সেসব বর্ণমালা রাতের অন্ধাকারেও পড়া যায়। যুবকটির অবস্থা দেখে আমাদের চোখ দিয়ে বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত অশ্রু ঝরতে লাগল। তখন আমার সঙ্গী শাইখ আবুল হাসান আমাকে বললেন ঃ কিয়ামতের দিন পুরো মুসলিম বিশ্বকে এদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। শুধু এই এক যুবকই নয়। কত যুবক আরও কত বুড়ো এভাবে বছরের পর বছর কাটিয়েছেন ক্ষুধা-তৃষ্ণার বিক্ষুব্ধ দরিয়ার মাঝে কিন্তু কারও কাছে সাহায্যের জন্যে হাত বাড়াননি। তাদের শংকা কেবল আখেরাত নিয়ে; তারা আশাবাদী কেবল আল্লাহর রহমতের।

সাহাবী হযরত সুহাইল ইবন সা'দ আস- সাঈদী (রা.) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ একরাত আল্লাহর পথে সীমান্ত পাহারা দেয়া পৃথিবী ও পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের চেয়ে উত্তম। এবং আল্লাহ'র পথে এক সকাল কিংবা এক বিকাল ব্যয় পৃথিবী ও পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের চেয়ে উত্তম। অর্থাৎ আল্লাহর পথে এক সকাল কিংবা এক বিকাল জিহাদ করা পৃথিবী ও পৃথিবীর সব কিছুর চেয়ে উত্তম। (বুখারী)

সাহাবী হযরত ফুযালা ইব্ন উবাইদ (রা.) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ যে কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার আমলনামা বন্ধ হয়ে যায়,

কিন্তু সীমান্তরক্ষী ব্যক্তি মারা যাবার পর কিয়ামত পর্যন্ত তার আমলনামা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সে কবরের আযাব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। *[আবু দাউদ]*

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লহ (সা.) মুজাহিদ ব্যক্তি কবরের আযাব থেকে মুক্ত থাকা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন ঃ তার মাথার উপর তলোয়ারের ঝিলিকই তাকে কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতিদানের জন্য যথেষ্ট। *[নাসাঈ শরীফ]*

হযরত উসমান (রা.) বলেন ঃ আমি রাসূলূল্লাহ (সা.)-কে একথা বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ'র পথে সীমান্ত পাহারায় একটি রাত কাটাবে সে এক হাজার দিবসের রোযা ও এক হাজার রজনী ইবাদতের নিমগ্ন থাকার সওয়াব লাভ করবে। *[ইব্‌ন মাজাহ্]*

সীমান্ত প্রহরীর জন্য এত সব পুণ্যের একটা যৌক্তিক কারণও আছে। অনেক সময় দেখা যায়, সীমান্ত পাহারা দিতে গিয়ে এক রাতে এত কঠিন ও ভয়ংকর কষ্টের মুখোমুখি হতে হয়– নিজ ঘরে হাজার রজনীতেও অতটা কষ্টের সম্ভাবনা থাকে না। তাছাড়া সীমান্তরক্ষী তাঁর স্বীয় জীবন আশংকায় রেখে অন্য মুসলমানদের দীন ঈমান এবং তাদের নামায রোযার পর্যন্ত সংরক্ষণ করেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন ঃ ফিৎনা নির্মূল হয়ে আল্লাহ'র দীনের পরিপূর্ণ বিজয় না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়তে থাক। *[আনফাল ঃ ৩৯]*

বক্ষমাণ আয়াতটিতে দুটি শব্দ সবিশেষ লক্ষণীয়। ১. ফিৎনা। ২. দীন! ইমামুত্ তাফসীর হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ এখানে ফিৎনা বলতে কুফরী ও শিরকে বোঝানো হয়েছে আর দীন বলতে পবিত্র ইসলামকে বোঝানো হয়েছে। এই হিসেবে আয়াতের মর্ম দাঁড়ায়, শিরক ও কুফরী চিরতরে নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত এবং তার স্থলে পবিত্র ইসলামের পরিপূর্ণ বিজয় সাধন না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া উচিত।

সীমান্তরক্ষী অতন্দ্র প্রহরীর মত জীবনের সকল আরাম-সুখ বিসর্জন দিয়ে রক্ষা করে ইসলামী নিদর্শনাবলী ইবাদতখানার গাম্ভীর্যপূর্ণ অস্তিত্ব। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে খ্রিস্টানদের নির্জন গির্জা, ইবাদতখানা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে অধিক পরিমাণে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়। [হজ.৪০] আয়াতের সার কথা হলো, যদি কাফেরদের সাথে লড়াই ও যুদ্ধের বিধান না থাকতো তাহলে কোনকালে কোন ধর্মই নিরাপত্তার সাথে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতো না। বরং মূসা (আঃ)-এর যুগে ইহুদীদের উপাসনালয়, ঈসা (আঃ)-এর যুগে খৃস্টানদের গির্জাঘর আর

সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগে মসজিদসমূহ ধুলোর সাথে মিশিয়ে দেয়া হতো, কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতো না।

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সীমান্ত প্রহরীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ইরশাদ করেন ঃ মুসলামানদের স্বার্থে যদি কোন ব্যক্তি এক রাত সীমান্ত পাহারা দেয় তাহলে সে সকল মানুষের কৃত নামায-রোযার সমপরিমাণ প্রতিদান লাভ করবে। *[আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ২য় খণ্ড, ২৪৫ পৃ.]*

অন্য একটি হাদিসে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে রোযা রাখবে আল্লাহ তাআলা তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। [বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, ৩৯৮ পৃ.]

আল্লাহর পথে অর্থ জিহাদরত অবস্থায়। এর কারণ হলো, জিহাদের ময়দানে রোযা রাখলে দ্বিগুণ কষ্ট হয়। জিহাদের কষ্ট, তার ওপর ক্ষুদা-তৃষ্ণার যাতনা। রোযা ছাড়া অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রেও জিহাদের ময়দানে প্রতিদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

আমি আফগান রণাঙ্গনে দেখেছি, রমযান মাসে মুজাহিদগণ রোযা রাখছেন। যুদ্ধ করছেন। এরই মধ্যে পরস্পরে বেশ উৎফুল্লচিত্রে খোশ গল্প করছেন, রসাত্মক কবিতা আবৃত্তি করছেন। তাদের মধ্যে ক্লান্তি কিংবা বিষণ্নতার ছায়ামাত্র নেই; বরং এক অলৌকিক আলোকাভা দীপ্তিময় করে রেখেছে তাদের মুখশ্রীকে। পরিপূর্ণ প্রাণ ও উদ্দীপনাসহ এমনভাবে লড়াই করছেন, যেন হাজার বছরের অবকাশপর্ব সমাপ্ত করে এই মাত্র রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়েছেন। আবার এই যুবকরাই যখন রাতের বেলা তারাবীহ নামাযে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণে ডুবে যায় তখন তাদের গণ্ডদেশ বেয়ে দরদরিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকে প্রকৃত মনিবের প্রতি ভয় ও ভালবাসায়। কারও কারও কান্না মাঝে মধ্যে কল্লোলিত হয়ে ওঠে! হৃদয়ে তখন মহা তুফানের সৃষ্টি হয়। আর এঁদের সম্পর্কেই তো মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন—

(وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ)

"যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াতে ভয় পায়
তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান।"

তাছাড়া কেউ চাইলেই তো আর আল্লাহ'র পথে যুদ্ধ করতে পারে না। এপথে সংগ্রাম করার সৌভাগ্য সেও মহান আল্লাহ'র বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি যাকে খুশি তাওফীক দান করেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

'মনে রেখ, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ'র রাসূল আছেন। তিনি যদি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তোমাদের কথা মানতে যান তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্তরে ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন, ঈমানকে সুশোভিত করে দিয়েছেন তোমাদের হৃদয়ে; তোমাদের কাছে অপ্রিয় করে দিয়েছেন কুফুরী পাপাচার ও অবাধ্যতাকে। আর এঁরাই হলেন সৎকর্মশীল। *[আল-হুজরাত ঃ ৬]*

এই আয়াত দ্বারা একথাই প্রতিভাত হয়, কল্যাণকর্মের প্রতি আকর্ষণবোধ আল্লাহ'র পথের জিহাদে অংশগ্রহণ এটা মানুষের শক্তি ও ইচ্ছাধীন নয়; বরং এটা আল্লাহ তাআলার একান্ত অনুগ্রহ।

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে; অচিরেই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসবেন। যারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর। তারা আল্লাহ'র পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কার কারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহ'র অনুগ্রহ–তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। *[মাইদা ঃ ৫৪]*

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, মুসলমানরা যদি ইসলামকে ছেড়ে দেয় তাতে আল্লাহ'র কিছু যায় আসে না। তিনি তাতে কোন পরোয়াও করেন না। কারণ, মুসলমানরা সধর্ম ত্যাগ করে বসলে আল্লাহ তাআলা তাদের স্থানে অন্য কোন জাতিকে দাঁড় করিয়ে দেবেন। সেই সাথে তিনি নতুন সেই গোষ্ঠীর গুণাবলীর কথাও আলোকপাত করেছেন অত্র আয়াতে। বলেছেন ঃ তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসবেন, তারাও ভালোবাসবে আল্লাহকে। তারা পরস্পরে নম্র-শান্ত আচরণ করবে আর কাফের বেঈমানদের বিরুদ্ধে থাকবে কঠিন শক্ত। তারা আল্লাহ'র পথে সংগ্রাম করবে ইসলামের প্রসার ও বিজয়ের লক্ষ্যে। আল্লাহ'র দীনকে সমুন্নত করার এই মহান সংগ্রামে তারা কখনো তিরস্কারকারীদের তিরস্কারকে ভয় করবে না। এই যখন আল্লাহ'র পক্ষ থেকে পরিষ্কার অঙ্গীকার, তখন মুমিনদের উচিত এপথে এগিয়ে আসা এবং ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

বর্তমান উম্মাহ বদর যুদ্ধের ফসল

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)

শহীদে বালাকোট সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.) এর রক্ত ও চেতনার পতাকাবাহী॥

"এবং নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বদর যুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন অথচ তোমরা ছিলে তখন অসহায়। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে করে কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পার।" *(আলে-ইমরান ঃ ১২৩)*

বক্ষমান আয়াটিতে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ইরশাদ করেছেন ঃ হে মুসলিম জাতি! তোমরা যখন অসহায় ছিলে, দুর্বল ছিলে, ভয়ানক আশংকায় ছিলে, ঠিক তখনি আমি তোমাদেরকে বদর যুদ্ধে বিজয় দান করেছি। তাই তোমরা আমাকে ভয় কর যাতে কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হতে পার।

সুধী মণ্ডলী!

আজকের এই বিশাল বর্ণাঢ্য তাবলিগী ইজতিমায় আমি এই আয়াতটি- পাঠ করেছি বলে উপস্থিত বিজ্ঞজনরা হয়তো তাজ্জব হতে পারেন। কেউ হয়তো ভাবতে পারেন, তাহলে বুঝি বদর যুদ্ধের ইতিহাস শোনাব আপনাদেরকে। কিন্তু আমার কথা হলো, শুধু দাওয়াত ও তাবলীগই নয়; বরং আমাদের মুসলমানদের সামগ্রিক জীবন, মুসলিম

উম্মাহর বর্তমান অস্তিত্ব, বিজয় ও সফলতার সাথে এই আয়াতের সম্পর্ক খুবই গভীর! বরং আমি ইতিহাসের একজন নগণ্য ছাত্র হিসেবে, একজন দৃষ্টিমান মানুষ হিসেবে যদি একথা বলি– বর্তমান পশ্চিমা বিশ্বে যে অসংখ্য মুসলমানের বসবাস, মুসলমানদের রাজত্ব ও শান-শওকত, ক্ষমতা ও সম্পদের প্রাচুর্য, দীনী দাওয়াত ও ইসলামী আদর্শের তৎপরতা, অসংখ্য মাদরাসা এমনকি আন্তর্জাতিক এই নদওয়াতুল উলামার মাদরাসার সুবিশাল লাইব্রেরী, বিশ্বময় অসংখ্য বর্ণাঢ্য লাইব্রেরী– রচনাবলীর বিশাল সম্ভার, ইতিহাস বরং পরিপূর্ণ মানবেহিতহাসে মুসলিম মিল্লাতের যে অবদান, জ্ঞানচর্চা, গবেষণা, রচনা, আল্লাহর ইবাদত, তাওহীদী বিশ্বাসের তরঙ্গময় জোয়ার, এই যে বিশ্বজুড়ে ইসলাম চর্চার, ইলাহী দাসত্বের আলোকময় দৃশ্য– এসবই বদর যুদ্ধে বিজয়ের ফসল এবং শুধুই বদর যুদ্ধে বিজয়ের ফলাফল। আমি তো বলব, এই যে আমরা নামায পড়লাম, এই যে আমরা রোযা রাখছি, যাকাত দিচ্ছি, হজ করছি এসবই সেই বদর যুদ্ধেরই আলোকিত ফসল। আজকের তাবলিগী ইজতিমা ও ইজতিমার এই চোখ জুড়ানো শীতল দৃশ্যও সেই বদর যুদ্ধেরই দান।

বদর যুদ্ধের সময় মুসলমানদের অবস্থা

মাত্র তিনশ' তেরজন মুসলমান! আল্লা'হর পথে সংগ্রামের অবিনাশী প্রত্যাশায় বেরিয়েছেন তাঁরা মদীনা থেকে। তাঁরা মদীনাকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর! সংগ্রাম তাঁদের আল্লাহ'র দীনকে হেফাযত করার লক্ষ্যে। এদিকে এক হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা প্রস্তুত! তারা মুখ ব্যাদান করে দাঁড়িয়ে আছে এই নবশক্তির মূলোৎপাটন করতে; এর অস্তিত্ব চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। তারা রণসাজে সজ্জিত হয়ে এসেছে। পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে এসেছে। অধিকন্তু তারা লড়াকু স্বভাবের লোক। এদিকে মুসলমানদের অবস্থা হলো, তাদের ঘরে খাবার নেই। সঙ্গী যোদ্ধাদের মধ্যে কয়েকজন কোমল বালক যোদ্ধাও আছেন। এবং তাঁরা সকলেই আল্লাহ'র পথে সংগ্রামের অসম প্রেরণায় উদ্দীপ্ত! আবেগ তাদের বাঙময়। কিন্তু এখানে তো প্রয়োজন আসবাব-উপায়-উপকরণের। সমরাস্ত্র, যোদ্ধা সংখ্যা, রণকৌশল, যুদ্ধের সামগ্রিক প্রেক্ষিত ইত্যাকার বিবেচনায় যে কোন সুস্থ বিবেকবান, অংক শাস্ত্রে সামান্য বোধ আছে যার, সেও বলবে এটা কি করে সম্ভব! একদিকে সশস্ত্র হাজার যোদ্ধা অন্যদিকে অসহায় তিনশ' তেরজন। এমন অসম যুদ্ধ হয়?

সন্দেহ নেই, পার্থিব জগতের সব কিছুই আল্লাহর সৃষ্টি। এবং সকল বস্তুর শক্তি বৈশিষ্ট্য এবং কার্যক্ষমতাও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তাই তাঁর ইচ্ছা ও

অভিপ্রায় যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুর শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের অনুকূলে ততক্ষণ পর্যন্তই সেই বস্তুর শক্তি ও ক্ষমতা বাস্তবতায় রূপায়িত হবে। বিজয় হবে হাজার জনের অসহায় নিরস্ত্র তিনশ' তেরজনের ওপর। আল্লাহ ক্ষমা করুন; তিনি যদি সেদিন এই সিদ্ধান্ত নিতেন তাহলে সেই তিনশ তেরজনের জীবন বিজয় ও অবদানের আলোচনা আজ কে করত? আর ইসলামই বা অবশিষ্ট থাকতো কিভাবে?

আমি যা বলতে চাই তাহলো, এটা ঐতিহাসিক সত্য, তিনশ; তেরজন হাজার জনের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। কিন্তু বলার কথা হলো– স্বাভাবিকতার পরিপন্থী, আকল ও বিবেকবিরোধী কায়দায় এই তিনশ'জনের বিজয় হলো কেন? এই কেনটাকেই গভীরভাবে বুঝতে হবে আমাদেরকে। বিজয়ের এই নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করতে হবে, স্মরণ রাখতে হবে, সঙ্গে রাখতে হবে এই উপলব্ধিটুকু! কারণ, অর্থ মানব কিংবা অস্ত্র বল তো তাঁদের ছিল না।

নবীজীর (সা.) অস্থিরতা

হযরত (সা.) অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি আল্লাহর দরবারে মুনাজাতে ভেঙ্গে পড়লেন। তাঁর সে অস্থিরতা হযরত আবু বকর (রা.) পর্যন্ত সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি (সা.) নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন! তিনি কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে দুআ করতে লাগলেন!

আবু বকর (রা.) জানতেন, তিনি যার সাথে কথা বলতে যাচ্ছেন তিনি আল্লাহর রাসূল। তিনি সরাসরি আল্লাহর পয়গাম লাভ করে থাকেন। তাঁর দরবারে ওহী অবতীর্ণ হয়। তিনি আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্যের প্রতি সর্বাধিক আশাবাদী। বরং প্রত্যয়-বিশ্বাসের অধিকারী। তিনি আল্লাহ তাআলাকে সর্ব বিষয়ে সক্ষম মনে করেন। তিনি আল্লাহর ফয়সালাকে বস্তু শক্তি ও অস্ত্রের অধীন মনে করেন না। অথচ তিনিই আজ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন। অবুঝ শিশুর মত কান্না! হযরত আবু বকর (রা.) ধৈর্যের বাঁধন ধরে রাখতে পারলেন না আর। অস্থিরতায় ভেঙ্গে পড়লেন তিনিও। বলে ফেললেন ঃ 'হে রাসূল! আর নয়! আল্লাহ দয়া করবেন! আপনি আর চিন্তিত হবেন।' আবু বকর (রা.) নবীজী (সা.)কে সান্ত্বনা দিলেন!

শাশ্বত সত্য নবীর এক ইলহামী উচ্চারণ

অতঃপর যে কথাটি বলতে চাই, সে কথাটি আমরা সকলেই হৃদয়ে গেঁথে নেব! আর সেই কথাটি হলো– বদর যুদ্ধের এই কঠিন মুহূর্তে হযরত (সা.)-এর জবান মুবারক থেকে একটি বাক্য উচ্চারিত হয়েছিল। সীরাত পাঠকরা সেই বাক্যটি পড়েন। তবে চিন্তা করেন না। থমকে দাঁড়ান না। সেই বাক্যের গভীরে

প্রবেশ করেন না। বাক্যটি নিয়ে দীর্ঘ সময় চিন্তা করেন না। অবস্থাটি এমন, যদি আপনাদের একজনকে বলি ভাই, আপনি এখন যে পথ দিয়ে হেঁটে আসলেন এ পথের ডান দিকে একটি সাইনবোর্ড আছে। আচ্ছা, সাইনবোর্ডটিতে কী লেখা আছে? বলবেন ঃ তা তো বলতে পারব না। প্রতিদিন কতবার এ পথে আসা যাওয়া করি, কিন্তু লক্ষ্য করে তো কখনো দেখিনি ওতে কি লেখা আছে। আর দরকারও তো নেই।

সীরাত পাঠকদের অবস্থাও অনুরূপ। বাক্যটির পাশ দিয়ে তারা রীতিমতোই যাতায়াত করেন। তবে খুব কম পাঠকই বাক্যটি নিয়ে চিন্তা করে। খুব কম পাঠকই ভাবে– এটা কেমন অদ্ভুত একবাক্য– ঘুমও চিন্তাকে সজাগ করে তোলে, ভাবিয়ে তোলে সমূহঅনুভব ও অন্তরসত্তাকে। বাক্যটি এমন যে, কেউ গভীর নিবিষ্টতাসহ যদি এই বাক্যটি পাঠ করে তাহলে সে স্তব্ধ হবে, বিচলিত হবে। ভেবে আকুল হবে নবীজী (সা.) এ কি বলছেন!

পরিস্থিতির পুরো খোঁজ খবর নিয়েছেন রাসূল (সা.)! শক্তি ও অস্ত্রের অবস্থা জেনেছেন। সংখ্যা ও মানসিক ব্যবধানের কথা জেনেছেন। দেখেছেন– কুরাইশরা রাগে-রোষে-ক্ষোভে ফেটে পড়বার উপক্রম আর মুসলমানগণ আল্লাহ বিশ্বাসে দৃঢ়-শান্ত; তাঁরা আল্লাহর সাহায্যকেই বিজয়ের উৎস বলে জ্ঞান করে। সংঘাতময় প্রচণ্ড উত্তপ্ত এক মুহূর্তে তিনি মহান মনিবের দরবারে এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করলেন যা শুধু চিন্তা করবারই নয় বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে মূলনীতি হিসেবে বরণ করে নেবার উপযুক্ত। তিনি বললেন—

اَللّٰهُمَّ اِنْ تَهْلِكْ هٰذِهِ الْعَصَابَةَ لَاتُعْبَدُ

"হে আল্লাহ! তুমি যদি এই ক্ষুদ্র জামাতটিকে
ধ্বংস করে দাও তাহলে তোমার ইবাদত
করার আর কেউ থাকবে না।"

অর্থাৎ হাজার যোদ্ধার বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে নিরস্ত্র বাহ্যত দুর্বল ও অসহায় এই তিনশ' তের সদস্যের ক্ষুদ্র কাফেলাকে তুমি যদি পরাজিত করে দাও, নিশ্চিহ্ন করে দাও, তাহলে তোমার এই বিশাল ভুবনে তোমাকে সিজদা করার, তোমার বন্দেগী করার আর কেউ থাকবে না। মূলত এমন ধরনের কথা একমাত্র নবীই বলতে পারেন– যিনি আল্লাহ তাআলার একান্ত প্রিয়ভাজন এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত মানুষও! সবচে' বড় কথা হলো—

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا
وَحْيٌ يُّوْحٰى ـ(سورة النجم ٢)

তিনি প্রবৃত্তির প্ররোচণায় কিছু বলেন না।

যা বলেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েই বলেন।' *(নাজম :২)*

তার প্রতি আল্লাহর প্রত্যাদেশ আসে। প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত এই মহান সত্তাই এই ইলহামী বাক্য উচ্চারণ করছেন। অন্যথায় কোন ওলী, কোন সিপাহসালার কিংবা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন অনেক বড় মুফাসসিরের পক্ষেও একথা বলা সম্ভব নয়।

আরও লক্ষ্য করার বিষয় হলো, তিনি একথা যে মহান পূতঃ পবিত্র সত্তার সমীপে আরয করছেন তিনি কিন্তু কারও মুখাপেক্ষী নন। তাকে কোন বিষয়ে ভয় দেখানো যায় না। মূলত এখানে প্রিয়তম নবীর মুখ দিয়ে এই অসাধারণ বাক্যটি তিনিই বলিয়েছেন, যাতে করে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলমান গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে থাকে এ কেমন কথা বলেছিলেন নবীজী! শত বিস্ময়ে তারা যেন দাঁতে আঙ্গুল চেপে নির্বাক চিন্তা করতে থাকে কেমন ভয়ংকর পরিবেশ, কত অলৌকিকভাবে, বিস্ময়কর ভঙ্গিতে বলেছেন তিনি একথা। মূলত নবীজীর এই একটি বাক্য সম্পর্কে চিন্তা করতে করতে কেউ যদি বিচলিত হয়ে পড়ে, অস্থির হয়ে পড়ে কিংবা জ্ঞান হারিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে তাহলে তাতে তাজ্জব হবার কিছু থাকবে না।

কিন্তু বাস্তব হলো আমরা ভাবতে অভ্যস্ত নই! এই যে রাসূল (সা.) ইরশাদ করলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি যদি এই ক্ষুদ্র দলটি ধ্বংস করে দাও তাহলে পৃথিবী থেমে যাবে না। পৃথিবীর কল কারখানা কাজ-কর্ম সবই চলবে; পৃথিবীতে আলো ঠিকই জ্বলবে; বিজয় ধারা ঠিকই অব্যাহত থাকবে; রাজত্বও থেমে যাবে না; সম্পদের বন্যাও যথার্থই বইবে; জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাও থাকবে; তবে একটি কাজ হবে না; তোমার একক অনাদি সত্তার ইবাদত বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর কি হলো? মহান রাব্বুল আলামীন সম্পূর্ণ অলৌকিকভাবে বিস্ময়কর পদ্ধতিতে তাঁর অসীম-পরিচিত শক্তির বিকাশ ঘটালেন। খোদায়ী ইচ্ছা, কুদরতী ক্ষমতা আর অলৌকিক আভিপ্রায়ে মাত্র তিনশ' তেরজনের বিজয় হলো হাজার জনের বিরুদ্ধে। নিরস্ত্রগণের বিজয় হলো সশস্ত্রদের বিরুদ্ধে।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ
وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ -

'বদর যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে
বিজয় দান করেছেন অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল।
সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর যাতে কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পার।

এর সারমর্ম এটাই, বাস্তব নিয়ম, সাধারণ বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার বিপরীতে সম্পূর্ণ অলৌকিক বিস্ময়করভাবে আল্লাহ তাআলা তিনশ' তেরজন নিরস্ত্র

মুজাহিদকে বিজয় দান করেছেন শুধু এই কথা প্রমাণ করার জন্য, এই তিনশ তেরজন তাঁর পৃথিবীতে তাঁর ইবাদত করবে; এঁদের মাধ্যমে তাঁর ইবাদতের ধারা অব্যাহত থাকবে বিশ্বময়।

বদরযুদ্ধে বিজয় ঃ হিকমত ও লক্ষ্য

একথা সকলেই জানেন, যখন কোন শর্ত, কোন গুণ কিংবা কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিরাট কোন ফলাফল বিকশিত হয়; বিশেষ কোন শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে যখন কোন অলৌকিক কাণ্ড ঘটে, যখন আল্লাহ'র পক্ষ থেকে বিস্ময়করভাবে বিজয় আসে তখন সেই গুণ শর্ত ও বৈশিষ্ট্যটি ধরে রাখাও অনিবার্য বলে বিবেচিত হয়। এর অর্থ হলো, এই পৃথিবীতে মুসলিম উম্মাহকে বেঁচে থাকার, সম্মান, স্বাধীনতা ও মর্যাদার সাথে টিকে থাকার; মুক্ত প্রাণে আল্লাহর বন্দেগী করার; অন্যকে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহবান করার; বিশ্বব্যাপী আল্লাহর বিধানাবলীর প্রচার ও বিজয় ঘটাবার; রাজ্য শাসন ও বিজয়ের ধারা অব্যাহত রাখার; আল্লাহর পরিচয়-মা'রিফাত, ইলমের সাধনা-অধ্যবসায় ও গবেষণার দরিয়া সৃষ্টির সুযোগ আল্লাহ পাক দেবেন। কিন্তু এসবের মূল প্রেরণা হতে হবে আল্লাহর ইবাদত। এই ইবাদতের জন্যেই তাদের অস্তিত্ব। ইবাদত করতে হবে নিজে; মেনে চলতে হবে আল্লাহ তাআলার বিধানাবলী; এ পথে ডাকতে হবে অন্য সকলকে। এবং একথাও মনে রাখতে হবে, ইবাদত শুধু নামায-রোযা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সঠিক আকীদা, বিশুদ্ধ লেন-দেন, বিধৌত চরিত্রগুণ, আল্লাহ'র আইন ও বৈবাহিক জীবনে আল্লাহর নিয়ম মান্য করাটাও ইবাদতের মধ্যে শামিল। এই ইবাদতের মধ্যে সহীহ ব্যবসা-বাণিজ্য পর্যন্ত শামিল।

সারকথা হলো, আল্লাহ তদীয় কিতাবে এবং রাসূল (সা.) তাঁর পবিত্র হাদিসে যে জীবন পথের নির্দেশনা দিয়েছেন– অবতীর্ণ সেই পূর্ণাঙ্গ শরীয়তের ওপর আমল করার লক্ষ্যেই সেদিন মহান আল্লাহ তআলা মাত্র তিনশ' তেরজনকে হাজার জনের বিরুদ্ধে জয়ী করেছিলেন। উম্মতের অস্তিত্বের মূল ভিত্তিই ছিল শরীয়তের ইত্তিবা।

আজ আমি একথা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলতে পারি, আজ পৃথিবীর মুসলমান যদি আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রে চড়ে বসে; আকাশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে; মুহূর্ত কিংবা সেকেন্ডে যদি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছে যায়; বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে বিস্ময়কর রেকর্ড সৃষ্টি করে ফেলে; জ্ঞানের সাগর সৃষ্টি করে লাইব্রেরীতে শহরের পর শহর পূর্ণ করে ফেলে; স্মৃতি, মেধা, আবিষ্কার, রহস্য উদঘাটন, সাহিত্য সৌকর্য, শারীরিক সৌন্দর্য, রূপ চর্চা,

শক্তি ও কৌশলে সর্বোচ্চ মাত্রায় উন্নীত হয়ে বসে– হোক! তবে ওসব কিছু উম্মতের অস্তিত্ব রক্ষার গ্যারান্টি দিতে পারবেন।

অস্তিত্বের গ্যারান্টি

উম্মতের অস্তিত্ব ও মর্যাদাময় প্রতিষ্ঠার গ্যারান্টি ও নিশ্চয়তা দিতে পারে আল্লাহ'র ইবাদত প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। কারণ, এই উম্মতকে বদর যুদ্ধে এই জন্যই আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করেছিলেন, তাঁরা আল্লাহর ইবাদতের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করবে। নিজে ইবাদত করবে; আল্লাহ'র বিধানের অনুসরণ করবে। বিশ্ববসীকে আহ্বান করবে আল্লাহ'র বিধান পালনের জন্য।

আচ্ছা, হযরত (সা.)-এর চেয়ে বেশি আল্লাহ তাআলাকে আর কে জানে? আল্লাহ'র শান আদব ও মর্যাদা আল্লাহ'র রাসূলের চেয়ে বেশি আর কে বুঝতে পারে? আর তিনি সে দিন আল্লাহর দরবারে যে কথাটি বলেছিলেন– আমি মনে করি, আল্লাহ তাআলাই তাঁর যবান দ্বারা এটা বলিয়েছেন। এবং তিনি এমন একটি গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, যার মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ'র জালাল ও জামাল-তাঁর মহান প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠে। অতঃপর তারই ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলা মুসলমানগণকে বিজয় দান করলেন। যাতে করে কিয়ামত পর্যন্ত সকলের জন্যে এটা মূলনীতি হয়ে থাকে, প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি হয়ে থাকে যে, মুসলমানদের অস্তিত্ব, জীবন, সম্মান, স্বাধীনতা ও অতীতকালের বিজয়সমূহ এই ইবাদতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। এমনকি ইসলামের আমল দাওয়াত ও তাবলীগের সিলসিলা সবই এর ওপর প্রতিষ্ঠিত।

আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারি, খেলাফতে রাশিদা থেকে খেলাফতে বনূ উমাইয়া পর্যন্ত, বনূ উমাইয়া থেকে খেলাফতে বনূ আব্বাসী পর্যন্ত, অতঃপর ইরান ও রুমের মত শক্তিশালী সাম্রাজ্যকে পরাজিত করা একান্তই অলৌকিক ব্যাপার ছিল। সেকালের ইরান-সাম্রাজ্যের সীমানা এসে ঠেকেছিল এই ভারত পর্যন্ত। আজকের ইরাকতো সেকালের ইরানেরই অংশ ছিল। অথচ এই বিশাল শক্তি ও সাম্রাজ্যসমূহকে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের করতলে এনে দিয়েছিলেন এই লক্ষ্যেই– তাদের দ্বারা ইবাদতের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। তাঁরা আল্লাহ'র ইবাদত, দাসত্ব ও গোলামিতে ডুবে থাকবে এবং এ পথে আহবান করবে অন্যদেরকও। আমি বলব, আজ পর্যন্ত মুসলমানরা যা কিছু লাভ করেছে, এমনকি এই যে আমরা মাগরিব নামায আদায় করলাম এটাও বদর যুদ্ধের বিজয়ের ফল ও বরকত। এই বিশাল তাবলিগী ইজতিমা, বাৎসরিক হজের

সম্মিলন, লক্ষ মানুষের মিলন মেলা; মিনা আরাফার অবস্থান, তাওয়াফ-তাকবীর, সাফা মারওয়ার সা'ঈ-বিশ্বময় মুসলিম মিল্লাতের শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন, ইবাদত বন্দেগী সবই সেই বদর যুদ্ধের ফসল।

ইসলামের মু'জিযা

পৃথিবীতে এ পর্যন্ত কত ধর্মই তো এসেছে। ইতিহাস পাঠ করলে দেখবেন, কোন ধর্ম একশ' বছর টিকেছে, কোনটি টিকেছে পঞ্চাশ বছর, কোনটি তারচেয়েও কম। তারপর বিকৃত হয়ে গেছে। অথচ ইসলাম আজও টিকে আছে। শুধু টিকেই আছে না-এতে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়নি আজ অবধি। আপন অবস্থায়, আপন বৈশিষ্ট্যে, স্বীয় আকীদা-বিশ্বাস ও সকল রীতি-নীতিসহ বহাল আছে সমহিমায়। আল্লাহ'র যিকর, নবীজীর প্রতিটি দরূদপাঠ, আল্লাহ'র প্রতি প্রেমময় আনুগত্য, রাসূলের (সা.) সাথে সুগভীর সম্পর্ক, সত্যের প্রতি সমর্থনও সহযোগিতার অবিনাশী প্রেরণা, অন্যায় ও বাতিলকে প্রতিহত করার সংগ্রামী চেতনাসহই বেঁচে আছে ইসলাম। অধিকন্তু এই উম্মত সত্যকে সত্য মনে করে, অন্যায়কে মনে করে অন্যায়। রিপু ও কামনার আহবান আর আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে বিশাল ব্যবধান স্বীকার ও মান্য করে এই উম্মত। পৃথিবীর কোথাও এই উম্মতের কোন উপমা নেই। আল্লাহ তাআলার মহানগ্রন্থ আল-কুরআনের এটা মু'জিযা বটে। সর্বাধিক পঠিত সূরা-সূরা ফাতিহায় ইরশাদ হয়েছে—

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ * صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ * غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ *

'আমাদেরকে সরলপথের সন্ধান দিন। তাঁদের পথ যাদের প্রতি আপনি নিআমত বর্ষণ করেছেন। পথভ্রষ্ট অভিশপ্তদের পথ নয়।'

বর্তমান পৃথিবীতে ইসলাম ছাড়া আসমানী ধর্ম বলতে দু'টি ধর্মই টিকে আছে– ইহুদীধর্ম ও খৃষ্টধর্ম। এই দুই ধর্মের একটিকে আল্লাহ তাআলা এই সূরায় 'অভিশপ্ত' বলেছেন অন্যটিকে বলেছেন 'পথভ্রষ্ট।' আর মুসলমানদের ধর্মকে বলেছেন– সরল সঠিক পথ। এই সরলপথ অর্জিত হয়েছে বদর যুদ্ধে। এবং মুসলমানগণ এই সরলপথ নিয়ে সেদিন মদীনায় ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। মদীনায় পৌঁছে তাঁরা বার বার পড়ছিলেন—

اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ (الانفال৭৩)

লক্ষ্য করুন! এই ক্ষুদ্র দল– অথচ সর্বাধিক মূল্যবান দলকেই লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে– হে ক্ষুদ্রতম মুসলিম বাহিনী!

হে মক্কা থেকে আগত মুহাজিরগণ! হে খায়বার বিজয়ী আনসারীগণ! শোন! তোমরা যদি কুফ্‌র ও শিরকের মোকাবিলা, অন্যায় ও অন্ধকার বিতাড়নে, দুনিয়াব্যাপী ইলাহী আলো প্রজ্বলনে, বিশ্ববাসীর মাথাকে আল্লাহ'র সামনে নত করতে বদ্ধপরির না হও; যদি সৎ চরিত্র আদর্শ ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠায় এবং রিপুপূজা, শায়তানিয়্যাত ও অপরাধ-চিন্তা থেকে বিশ্বমানবকে মুক্ত করতে কঠিনপদে না দাঁড়াও—

"تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ

'তাহলে পৃথিবীতে এক বিরাট বড় ফিৎনা ও বিপর্যয় ঘটে যাবে।'

আমি ইতিপূর্বে মক্কা শরীফে আরবদেরকেও বলেছি, আপনারা সংখ্যায় স্বল্প হলেও মূল্যে অনেক বেশি। আপনাদের পূর্বসূরিগণও তো সংখ্যায় খুবই নগণ্য ছিলেন! একমুঠো ছিলেন তাঁরা পরিমাণে। বুখারী শরীফের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, তিনবার মুসলমানদের মধ্যে আদম শুমারী হয়েছে। তার মধ্যে কোনটায় কয়েকশ' আর শেষবারে মাত্র দুই-আড়াই হাজারে গিয়ে ঠেকেছিল। অর্থাৎ সংখ্যায় ছিলেন তাঁরা খুবই সামান্য। কিন্তু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, কল্যাণ ও দাওয়াত, কর্ম ও অবদানের হিসেবে সর্বদাই ছিলেন অনেক মূল্যবান। আজও যদি আদম শুমারী করা হয় তাহলে মুসলমানদের সংখ্যা কমই হবে। কিন্তু সেই স্বল্প সংখ্যাকে কি করে অনেক মূল্যবান বানানো যায় সেটাই প্রধান বিষয়। আর এর একমাত্র পথ হলো পবিত্র ইসলামের অনুসরণ।

ইবাদতের মর্ম

কুরআন-হাদীসের পরিভাষা অনুযায়ী ইবাদতের মর্ম খুবই ব্যাপক। যদিও আমরা সামান্য দু'আ, এক-দুই রাকাত নামাযকেই ইবাদত মনে করি। আরবি ভাষার রীতি অনুযায়ী ইবাদতের মধ্যে আল্লাহ তাআলার সমস্ত বিধানাবলীই এসে পড়ে। আমি প্রায়ই বলে থাকি, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ
كَافَّةً وَلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ـ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে
প্রবেশ কর! আর শয়তানের পদাংক অনুসণ করো না।'

এই আয়াতের মর্মকথা হলো, হে মুমিনগণ! তোমরা একশতে একশ' ভাগ মুসলমান হয়ে যাও! এখানে শতকরা পঞ্চাশ, ষাট কিংবা সত্তর ভাগের কোন

অবকাশ নেই! ষাটভাগ দীনের ওপর চলব এটা কোন মুসলমানের জন্যেই বৈধ নয়। বরং দ্বীন মানতে হবে একশ পার্সেন্ট। ইসলামের আইন ও বিধানে সম্পূর্ণভাবে অনুপ্রবেশ করতে হবে। মসজিদে পা রেখে শরীর বাইরে রেখে দিলাম –এতে মসজিদে অনুপ্রবেশ করা হবে না। অনুপ্রবেশ করতে হবে পুরোপুরি। এমন হলে হবে না, নামায পাঁচ ওয়াক্ত ঠিক আছে। বিশ্বাস ও করেন, মানেন ও। কিন্তু বিবাহ-শাদীর ক্ষেত্রে আর আল্লাহর বিধানের অনুসরণ করেন না; বরং সে ক্ষেত্রে গিয়ে বলেন– এটা তো একান্তই ব্যক্তিগত কিংবা খান্দানী বিষয়। এটা একান্তই সামাজিক বিষয়। এখানেও দ্বীনকে টেনে আনার কী আছে। সর্বত্র যৌতুকের প্রচল আছে। মানুষ চাচ্ছে, নিচ্ছে। সুতরাং মুসলমানরাও যদি চায় তাহলে তাতে আপত্তির এমন কি আছে? এটা একটা সমাজ পরিবেশ ও খান্দানী বিষয়। আমি বলি, না, মুসলমানদের জন্য এমনটি করার অবকাশ নেই।

বিশ্বাস, চেতনা, চরিত্র, লেন-দেন সামাজিক আচার-আচরণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি খামার থেকে শুরু করে পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে। কারণ, এই উম্মতকে আল্লাহ তাআলা তখনই অনিবার্য ধ্বংস ও পতনের হাত থেকে রক্ষা করেছেন যখন হযরত রাসূলে কারীম (সা.) এই দু'আ করেছেন।

"اَللّٰهُمَّ اِنْ تَهْلِكْ هٰذِهِ الْعَصَابَةَ لَاتُعْبَدْ فِى الْاَرْضِ

"হে আল্লাহ! যদি এই ক্ষুদ্র দলটি ধ্বংস করে দাও তাহলে
তোমার ইবাদত করার কেউ থাকবে না।"

হযরত (সা.) তো আল্লাহ বিশ্বাস, আল্লাহ'র মহান মর্যাদা, বড়ত্ব ও শক্তির বিশালত্ব সবকিছু সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফ ছিলেন। তারপর তাঁর যবান থেকে এই বাক্যটি বের হয়েছে, যা পাঠ করলে যে কাউকে স্তব্ধ হতে হয়, বিবেক বুদ্ধি খেয়ে যায়। যদি নির্ভরযোগ্য সীরাত গ্রন্থে এবং বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে এর প্রমাণ পাওয়া না যেত তাহলে কেউ এই উচ্চারণের সাহস করতো না।

আমি বলি, এই উম্মতকে আল্লাহ পাক নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন; জীবনকে দীর্ঘায়িত করেছেন; জীবন-যাপনের সমূহ আয়োজনকে সহজ করে দিয়েছেন। বার বার আসমান থেকে খোদায়ী সাহায্য এসেছে এবং আজও তিনি রক্ষা করে বাঁচিয়ে রাখছেন এই উম্মতকে–মূলত এই ইবাদতের জন্যই।

আপনারা হয়তো জানেন না, আমেরিকা ও ইজরাইল মিলে এমন এক যৌথ ও সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যার মূল টার্গেট হলো, মুসলিম মিল্লাতকে সমূলে বিনাশ করে দেয়া। প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রকে স্পেনে পরিণত করা। মুসলিম

মিল্লাতকে আত্মমর্যাদাবোধ, দ্বীনি অনুপ্রেরণা, দ্বীন ও ইসলামের প্রতি প্রেম ও অনুরাগ শূন্য করে দেয়া। ইসলামের প্রতি গর্ববোধ ও অহংকার বোধের চেতনাকে হত্যা করতে তারা বদ্ধপরিকর। তাদের প্ল্যান হলো, সকল জনপদকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখা; স্বাধীনতার ভাওতা তুলে নারী সমাজকে পুরো মানবতার বিপক্ষে নিয়ে দাঁড় করানো! এবং এই জঘণ্য অন্ধ ও পশু পরিকল্পনার ভেতরও উম্মাহ বেঁচে আছে, ইনশাআল্লাহ বেঁচে থাকবে! কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকবে! বেঁচে থাকবে ইবাদতের জন্য, ইবাদতের প্রতি দাওয়াত দানের জন্য।

মুসলিম উম্মাহ'র কর্তব্য

আমার ভায়েরা!

মূলত হযরত (সা.) আল্লাহর দরবারে দু'আ করেছেন– যেন তাঁর ই বাদতের পরম্পরা বজায় রাখার লক্ষ্যে এই উম্মতকে ধ্বংস না করা হয়। আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবের এই প্রার্থনাকে মঞ্জুর করেছেন। তাই আজ এই যে আমরা নামায পড়ছি, জুমু'আ পড়ছি, দ্বীনী আলোচনা করছি, বছরে একবার হজ করছি, স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করছি– এসবই সেই মুনাজাতেরই ফসল। আর এ সকলের জন্যই আমাদের অস্তিত্ব।

আমরা সকলেই যদি বাদশাহ হয়ে যাই, 'আল্লাহ না করুন' আমরা সকলেই যদি সময়ের হামান, কারুন ও ফেরাউন হয়ে যাই; স্কলার ইঞ্জিনিয়ার, প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাই– তাহলে এ সকল পদ ও ক্ষমতা কিন্তু আমাদের রক্ষা করতে পারবে না, বরং আল্লাহর দরবারে এসবের কারণে আমরা বেঁচে থাকার অধিকার লাভ করতে পারব না। কারণ, রাসূল (সা.) তো সেদিন পরিষ্কারই বলে দিয়েছিলেন– 'খোদা হে! যদি এই ক্ষুদ্র দলটি ধ্বংস করে দাও তাহলে তোমার এই কারখানা যথারীতিই চলবে কিন্তু তোমার ইবাদত হবে না! তোমার ইবাদতের জন্য চাই এই উম্মত!

মূলত দ্বীনের তাবলীগ ও দাওয়াত শুধু এই কথাগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যই! এবং উম্মতের প্রধান কর্তব্যও এটাই– নিজে আকণ্ঠ ডুবে থাকবে আল্লাহর ইবাদতে; অনন্তর অন্যকেও ডাকবে আলোকিত এ পথে। আর এটা ছাড়া এই উম্মতের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকারও কোন অধিকার নেই।

রিপু পূজা নয়; প্রয়োজন আল্লাহ'র গোলামি

পৃথিবীর মানুষ ডুবে আছে পার্থিব সংকীর্ণতায়। ফ্যাশন, স্বকল্পিত জীবনবোধ, সেকি মর্যাদা, প্রেস্টিজ ও স্ট্যান্ডার্ডবোধ আজ মাবুদে পরিণত হয়েছে।

এসব আসার অনুসঙ্গ ছাড়া তারা বাঁচতে পারে না; চলতে পারে না। এসব ফ্যাশনপূজারী আত্মভোলাদেরকে বোঝাতে হবে– জীবনে সত্যিকারের স্বাধীনতা কাকে বলে, জীবনের প্রকৃত স্বাদ কিসে! এই ইউরোপ আমেরিকা যত বড় অর্থের মালিকই হোক না কেন, যত বড় সামরিক শক্তির অধিকারীই হোক না কেন; বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও সংস্কৃতিতে তারা যত সমৃদ্ধই হোক না কেন- তারা প্রকৃতপক্ষে নফস ও রিপু পূজারী! তারা যন্ত্র ও প্রযুক্তির দাস। তারা তাদের হাতের তৈরি ফ্যাশনের এমনভাবে গোলামি করে যেমন কোন কৃতদাস তার মালিকের দাসত্ব করে।

সুতরাং এখন আমাদের মুসলমানদের কর্তব্য হলো, তাদেরকে এই পার্থিব সংকীর্ণ জগৎ ও বিশ্বাসের গোলামি থেকে মুক্ত করে পৃথিবীর বিশাল মুক্ত স্বাধীন ভুবনে নিয়ে আসা! তাদেরকে মুক্ত বিশ্বাস ও বাতাসের সাথে পরিচিত করে তোলা। প্রকৃত স্বাধীনতার রূপ তাদের সামনে তুলে ধরা। এবং সংকীর্ণ বিশ্বাস, নফস ও রিপুর গোলামি থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর গোলামি ও দাসত্বের চিরকল্যাণময় সুতোতে গেঁথে দেয়া।

আমাদেরকে আজ দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করতে হবে, আমরা যদি কল্যাণ চাই, সম্মান চাই, পরকালীন বিজয় সফলতা ও অসীম নিয়ামত চাই, তাহলে নিজেদেরকে প্রত্যয়সূত্রে গেঁথে রাখতে হবে ইবাদতের সাথে। অধিকন্তু আমরা যেখানেই থাকব, যে অবস্থাতেই থাকব– থাকবো এই মহান দ্বীনের দাঈ হিসেবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই তাওফীকই দান করুন! আমীন!!

রাসূলুল্লাহ (সা.)এর যুদ্ধ এবং প্রতিরক্ষা কৌশল

ডক্টর মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ (রহ.)

জগদ্বিখ্যাত জ্ঞানতাপস, হযরত (সা.) এর চিন্তা ও আদর্শের বিপ্লবী দা'ঈ॥

প্রাককথন

'নবী যুগের প্রতিরক্ষা কৌশল' বিষয়টি সম্ভবতঃ সীরাতুন্নবীর সর্বাধিক কঠিন বিষয়। বিশেষ করে আমার জন্যে। কারণ, আমি এই বিষয়ের বর্ণ-বিন্দু কিছুই জানি না। জীবনে কখনো সৈনিক হবার সুযোগও হয়নি আমার। তবে পড়াশোনা করে যতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছি সে আলোকেই কিঞ্চিৎ আলোকপাত করব।

প্রতিরক্ষা বিষয়টি যে কোন দেশের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এর জন্য শুধু সামরিক প্রস্তুতিই যথেষ্ট নয়; বরং বেসামরিক ব্যবস্থাপনাও এক্ষেত্রে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বেসামরিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেই প্রাথমে কিছু কথা বলে নেয়া অপরিহার্য মনে করছি। কেননা, সদ্যপ্রসূত মদীনায় সবুজ-কিশোর ইসলামী রাষ্ট্রটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় প্রিয় নবীজীর (সা.) নিপূণ-নিখুঁত কর্ম-কৌশল উপলব্ধি করতে হলে এ বিষয়ে সামান্য হলেও ধারণা থাকা অনিবার্য। তাই সূচনাতেই আমাদের জানতে হবে, মুসলমানদের প্রিয় দেশ মদীনাকে সকল শংকা, বিপদ ও অজানা আক্রমণ থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে রাসূল (সা.) কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

আমরা একথা সকলেই জানি, একটি তপ্ত-কঠিন পরিস্থিতিতে প্রচণ্ড চাপের মুখে হযরত (সা.) এবং

তাঁর সঙ্গীগণ মদীনায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এখানে এসেও যদি তাঁরা নিরাপত্তা পেতেন, পূর্ণমাত্রায় অনুকূল পরিবেশ পেতেন তাহলে হয়তো নতুন কোন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করতে হতো না। কিন্তু বর্বর-পৌত্তলিক গোষ্ঠী এখানেও তাঁদেরকে শান্তিতে থাকার সুযোগ দিল না। কী ভয়ানক! আপন মাতৃভূমি থেকে নির্বাসিত করেছে। বাপ-দাদার সম্পদ দখল করে নিয়েছে। বছরের পর বছর ধরে সম্ভাব্য সকল পথেই নির্যাতন করেছে। তারপর যখন নির্যাতনে অতীষ্ঠ হয়ে অন্য দেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে সেখানেও শান্তিতে নিরাপদে থাকতে দেবে না; বরং তারা মদীনাবাসীর কাছে এ মর্মে চিঠি পাঠায়, আমাদের শত্রু (হযরত মুহাম্মদ সাঃ)কে হয়তো মেরে ফেল, নইলে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দাও। আর যদি তা না কর তাহলে আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবো। বলাবাহুল্য, এটা সেই সময়ে এমন একটি সামরিক হুমকি ছিল, যা কোন অবস্থাতেই অবহেলা করা যায় না। বিশেষ করে এই পরিস্থিতিতে তিনিতো নীরব থাকতে পারেন না, যিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য আদর্শ–সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি আদর্শ শাসকের জন্যও শাসিতের জন্যও। রাজার জন্যও তিনি আদর্শ–ফকীরের জন্যও। আদর্শ আলিম-জাহিল সকলের জন্যই। আর সে কারণেই তিনি শাসক সেনাপতি সকলের জন্যই এক অনুকরণীয় বরেণ্য শিক্ষা রেখে গেছেন–যার তুলনা মানব ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই।

মদীনায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পূর্বে যে বিষয়টি গোচরে আনা অনিবার্য ছিল তাহলো সদ্য নির্বাসিত বিদেশী মুহাজির সাহাবীদের যথাযথ পুনর্বাসন ও স্বাচ্ছন্দময় জীবিকা নির্বাহের আশু আয়োজন। তাই তিনি প্রথমে এখানেই হাত দিয়েছেন এবং চোখের পলকে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রচনা করে আবাস ও জীবিকার সকল গ্রন্থি উম্মোচিত করে ফেলেন। সমস্যার ভয়াল কুয়াশা মুহূর্তে কেটে যায়।

অতঃপর তিনি নজর দেন মদীনার সার্বিক পরিস্থিতির দিকে। তিনি লক্ষ্য করেন, মদীনায় কোন প্রশাসনিক কাঠামো নেই; বরং সেখানে ছিল কবীলাকেন্দ্রিক জীবনব্যবস্থা। যে কারণে এই কবীলা এবং গোত্রগুলো অতীত কোন সংঘাতের জের ধরে বছরের পর বছর ধরে গৃহযুদ্ধে জ্বলতে থাকতো। অবিরাম জ্বলতো তাদের মধ্যে পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ আর বিচ্ছিন্নতার আগুন। আর এই বিচ্ছিন্নতার দরুন কোন এক গোত্রের ওপর তাদের শত্রুপক্ষ আক্রমণ করলে অন্য গোত্রের লোকেরা নীরবে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখতো। তাই একান্ত একাকী হয়েই শত্রুর মোকাবিলা করতে হতো প্রতিটি কবীলাকে। নাজুকতর এই পরিস্থিতিতে অসীম বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন হযরত (সা.)। তিনি বিচ্ছিন্ন মদীনাবাসীর কাছে প্রস্তাব করলেন ঃ আমাদের ধর্ম ও গোত্রগত স্বাতন্ত্র বজায়

রেখেও কি একটা ছোট্ট রাষ্ট্র কায়েম করতে পারি না। কারণ, এই সমাজের প্রতিটি অংশের সংরক্ষণের স্বার্থে আমাদের একটি কেন্দ্রীয় শক্তির প্রয়োজন। আমাদের সকলের সম্মিলিত এই শক্তি আমাদের শত্রুপক্ষের যে কোন আক্রমণকে প্রতিহত করবে। মদীনার লোকেরা প্রস্তাবটির যৌক্তিকতার প্রতি বেশ আকৃষ্ট হলো এবং মদীনার অধিকাংশ অংশই তা মেনে নিল। ইহুদী মুশরিক মুসলমান সকলেই শরীক ছিল এই রাষ্ট্রযন্ত্রে। আর সকলে মিলে সর্বসম্মতিক্রমে হযরত (সা.)কে তাদের প্রধান হিসাবে নির্বাচন করল। অতঃপর যেসব বিষয় কেন্দ্রীয় ক্ষমতার আওতাভুক্ত থাকা জরুরি ছিল সেগুলো কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অধীনে নীত হলো আর যেসব ক্ষুদ্র বিষয় কেন্দ্রীয় ক্ষমতার আওতাভুক্ত করা জরুরি মনে করা হয়নি সেগুলোর ক্ষেত্রে সকল গোত্র ও দলকে সম্পূর্ণ এখতিয়ার ও স্বাধীনতা দেয়া হল। এবং কেন্দ্রীয় ক্ষমতার কাছে সমর্পিত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিই ছিল প্রতিরক্ষা বিষয়– সামরিক ব্যবস্থাপনা।

সদ্যপ্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রশক্তির গঠনতন্ত্রে পরিষ্কার ভাষায় লিখে দেয়া হল, যদি কোথাও কোন শত্রুর সাথে আমাদের লড়াই হয় তাহলে সেখানে নেতৃত্ব দেবেন হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)! যদি মদীনার বাইরে গিয়ে আমরা লড়াই করতে বাধ্য হই তাহলে ফৌজের মধ্যে কাকে রাখবেন আর কাকে বাদ দেবেন এর এখতিয়ার সম্পূর্ণরূপেই হযরত মুহাম্মদের (সা.)! এবং এটা এই জন্য, যাতে কোন গুপ্তচর মুনাফিক ও গাদ্দার দলে ঢুকে আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তিকে পরাস্থ করতে না পারে। এই ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা।

মুহাজির সাহাবীগণের আবাস ও জীবিকার ব্যবস্থা এবং মদীনার অধিবাসীদের একই সূত্রে গ্রথিত করার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো সফর করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সর্বপ্রথম মদীনার উত্তরে তিন-চার মাইল দূরেই অবস্থান করতো 'জুহাইনা' কবীলার লোকেরা। তখনও তারা মুশরিক ছিল। এতদ্বসত্ত্বেও তারা মুসলমানদের সাথে সামরিক বন্ধুত্ব গড়তে সম্মত হয়। তাদের সাথে কৃত চুক্তির বিস্তারিত বর্ণনা থেকে একথাই অনুমিত হয়। এক্ষেত্রে সম্ভত রাসূল (সা.) তাদেরকে এভাবে বুঝিয়েছিলেন, তোমরা তো একাকী একটি কবীলা। তোমাদের কোন বন্ধু নেই, অথচ শত্রু আছে। সুতরাং আমাদের সাথে একটি চুক্তি করে নাও। তোমাদের ওপর কেউ আক্রমণ করলে আমরা এগিয়ে আসব আর আমাদের ওপর কেউ আক্রমণ করলে তোমরা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। তারা এতে সম্মত হয় এবং এই চুক্তিতে শুধু সামরিক বন্ধুত্বই স্থান পায়; দ্বীনী কোন বিষয় এর আওতাভুক্ত ছিল না।

অনুরূপভাবে মদীনা থেকে দক্ষিণাঞ্চলে যান। দক্ষিণাঞ্চলে কবীলাগুলোর সাথেও অনুরূপ যুদ্ধচুক্তি হয়–যাতে অমুসলমানরা মুসলমানদের সাথে গভীর

চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। অতঃপর পূর্বাঞ্চলের কবীলাগুলোসহ পাঁচ-সাতটি কবীলার সাথে প্রতিরক্ষামূলক চুক্তি সম্পাদিত হয় বলে ঐতিহাসিক সূত্রগুলোতে প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই চুক্তিগুলোর বিষয় ও ভাষ্য একথাই বলে, মদীনা শহরকে এমনভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছিল, কেউ মদীনার ওপর আক্রমণ করতে চাইলে সে সরাসরি মদীনায় পৌঁছুতে পারবে না; বরং মদীনার পার্শ্ববর্তী কবীলাগুলোর বাধার মুখোমুখি হতে হবে তাকে এবং তারা যথাসময়ে মদীনাবাসীকে সংবাদ জানিয়ে দেবে; তাদের আত্মরক্ষায় চুক্তিবদ্ধ কাবীলাগুলো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে আসবে। এক কথায় মদীনার চারপাশে প্রতিরক্ষার একটি বৃত্ত-প্রাচীর গড়ে তুলেছিলেন নবীজী–প্রতিরক্ষা চুক্তির মাধ্যমে। এটা ছিল প্রতিরক্ষার একটি দিক।

দেশের প্রতিরক্ষার জন্য কেবল সামরিক ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয় বরং মাঝে মধ্যে অসামরিক ব্যবস্থাও নিতে হয়। রাজনৈতিক পথেও এগুতে হয়। এক্ষেত্রেও হযরত (সা.) মুসলমানদের জন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। একথা সকলেই জানেন, মক্কায় মুসলমানদের প্রতি কি নির্মম নির্যাতন চলেছিল। কয়েকজন সাহাবীকে হত্যা পর্যন্ত করেছিল তারা। তাদের সম্পদ লুটে নিয়েছিল, বাড়ি-ঘর দখল করে নিয়েছিল। অর্থনৈতিক অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। তাই স্বভাবতই এই মুসলমানদের অধিকার ছিল, জীবন ও অর্থের এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়ার। কিন্তু জানের প্রতিশোধ নেয়ার মত শক্তি সামরিক সামর্থ্য মুসলমানদের সঞ্চয়ে তখনও জমেনি, তাই মুসলমানগণ হযরত (সা.)-এর ইঙ্গিতে মক্কার কাফেরদের প্রতি অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করেন।

মক্কাবাসীদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। কিন্তু মক্কাবসীদের যে ব্যবসায়ী কাফেলাটি মক্কা থেকে দক্ষিণ দিকে ইয়েমেনে যেত সেটা মদীনাবাসীর দ্বারা আক্রান্ত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হবার কোন উপায় ছিল না। অবশ্য এই কাফেলাটি যখন উত্তরে ইরাক, শিরিয়া অথবা মিসরের দিকে যেত তখন তাকে অবশ্যই মদীনার পাশ দিয়ে যেতে হতো। তখন রাসূল (সা.) ঘোষণা করে দিলেন, তোমরা আমাদের পাশ দিয়ে যেতে পারবে না। আমাদের বলতে শুধু মদীনা শহরই নয়; বরং মদীনার সাথে চুক্তিবদ্ধ এলাকাগুলোও এই নিষিদ্ধতার আওতায় ছিল। স্বাভাবিকভাবেই এটা কুরাইশদের জন্য ভীষণ অপছন্দের বিষয় হয়ে দাঁড়াল। সাথে আত্মমর্যাদার প্রশ্নও! তাই তারাও পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিল আমরা এপথে যাবোই।

তখন মুসলমানদের সংখ্যা তো ছিল এক মুঠোর মত। আর চলাচলের জন্যও কোন মহা সড়ক ছিল না। তাই একপথে কাউকে বাধা দিলে পালাবার শত পথ উম্মুক্ত ছিল। তাই কুরাইশী কাফেলাকে বাধা দেয়া মোটেও সহজ বিষয় ছিল না।

যে কারণে বারবার চেষ্টা করেও সফল হওয়া যায়নি। যেমন–বদরযুদ্ধ সংঘটিত হবার পূর্বে প্রায় সাতবার মুসলমানগণ সংবাদ পেয়েছেন কুরাইশী কাফেলা যাচ্ছে। কিন্তু ছুটে গিয়ে ধরতে পারেননি। কোন না কোনভাবে তারা পালাতে সক্ষম হয়েছে। অবশ্য মুসলমানগণও থেমে যাননি। সংবাদ সংগ্রহের প্রক্রিয়া উন্নতকরণ, সহযোগী বন্ধুদের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ নানাভাবে প্রচেষ্টার অগ্রগতি সাধনে ডুবে ছিলেন তাঁরা। তাঁদের এই লাগাতার প্রচেষ্টা কুরইশীদের বুঝিয়ে দিল, মুসলমানরা সহজে ছাড়ছে না। ফলে কুরাইশীদের শক্তির পথ নিয়ে ভাবতে হল এবং তারা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হল শক্তি প্রয়োগের।

বদর যুদ্ধ

বদর যুদ্ধের সামান্য পূর্বের ঘটনা। হযরত (সা.) জানতে পারলেন ঃ কুরাইশরা উত্তরে ব্যবসায়িক সফরে বেরিয়েছে। তখন তিনি চিন্তা করলেন, তারা নিশ্চয় এ পথে ফেরত আসবে। বিকল্প কোন পথ তো নেই। তিন দ্রুত দু'জন গোয়েন্দা পাঠালেন। বলে দিলেন, তোমরা তাদের কাছাকাছি থাকবে। তারা যখন মক্কায় প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেবে তখন দ্রুত এসে আমাদের জানাবে। বাণিজ্য কাফেলা আর গোয়েন্দাদের বাহন ছিল অভিন্ন– উট। তাই গতিও ছিল এক। তারা চলছিল সামান্য ব্যবধানে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, তাঁরা ঝড়োবেগে উট হাঁকিয়ে এসে যখন মদীনায় পৌঁছলেন তখন দেখলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের আগমনের সংবাদটি জেনে ফেলেছেন, এবং তিনি রীতিমত তাদের বাধা দেয়ার জন্য মদীনার বাইরে চলে এসেছেন। এই ঘটনা থেকে সহজেই একথা অনুমিত হয়, শত্রুপক্ষের সংবাদ সংগ্রহের জন্য হযরত (সা.) নানা রকমের উপায় অবলম্বন করতেন এবং খুব লক্ষ্য রাখতেন, যাতে শত্রুপক্ষ তাদের সংবাদ জানতে না পারে।

রণ-কৌশল

সারকথা, হযরত (সা.) মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং সামরিক বিচক্ষণতার দরুন মদীনা থেকে উত্তরে না গিয়ে দক্ষিণে মক্কার দিকে অগ্রসর হোন। উদ্দেশ্য, যাতে শত্রুপক্ষের আগেই কোন উন্নত-উপযুক্ত জায়গায় গিয়ে তাঁবু করা যায় এবং সহজে শত্রুপক্ষকে কাবু করা যায়। এ কারণেই 'বদর' নামক স্থানকে নির্বাচন করা হয়। বরকতময় এই স্থানটি স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বদর প্রান্তরের চারপাশে উঁচু পাহাড়বেষ্টিত। প্রান্তর পর্যন্ত পৌঁছার পথগুলো সরু-অপ্রশস্ত। তাই এখানে সহজেই পাহাড়ের ঘাটিতে লুকিয়ে থেকে একসাথে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার একটা সুযোগ ছিল। বদর পর্যন্ত যেতে যেতে রাসূল (সা.) বিভিন্নভাবে কুরাইশদের সংবাদ এবং খোঁজ-খবর রেখেছেন।

কখনো দু'চারজন সাহাবী পাঠিয়ে কখনো নিজেই দু'একজন সাহাবী নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন এবং গ্রাম্য চাষা লোকদের জিজ্ঞেস করতেন কুরাইশরা এখন কোথায় আছে? এতেও কিছু তথ্য হযরত (সা.)-এর হাতে এসে পৌঁছে। 'বদর'–এ পৌঁছে তিনি জানতে পারেন কুরাইশরা এখনও ছুটে যায়নি। নাগালেই আছে। নবীজী (সা.) পরামর্শে বসেন। পরামর্শক্রমে বদর প্রান্তরের দুর্গম একটি স্থান গ্রহণ করেন।

এখানে দু'এক দিন অবস্থান করেন রাসূল (সা.)। এরই মধ্যে কুরাইশদের কাফেলা এসে পৌঁছায়। কিন্তু কুরাইশরা পূর্ব থেকেই অবগত, এ পথটি তাদের জন্য খুব নিরাপদ নয়। কারণ, যাবার পথেও মুসলমানগণ বাধা দিয়েছিল। প্রায় যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়ে পড়েছিল। তাই খুবই সতর্কতার সাথে পথ চলতে হচ্ছিল তাদের। কাফেলার সরদার ছিলেন মক্কার বিশিষ্ট নেতা আবু সুফ্য়ান। তিনি বদর এলাকায় প্রবেশের পূর্বেই কাফেলা থামিয়ে দিলেন এবং খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য দু'জন সঙ্গীসহ বেরিয়ে পড়লেন। এখানকার পথ ঘাট তার চেনা। কোথায় মানুষের সাক্ষাৎ এবং জুরুরি তথ্য পাওয়া যাবে তাও তিনি জানেন। সেমতে তিনি এমন একটি স্থানে পৌঁছেন যেখানে একটি ক্লাবের মত ছিল। লোকজন সব সময় এখানে আসা-যাওয়া করত। কাছেই ছিল একটি পানির কূপ। সেখানে সামান্য অবস্থানের পর পানি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আসা লোকদের কাছে তাদের এলাকার সরদারের আবাস কোথায় জানতে পারেন এবং সরদারের সাথে গিয়ে সাক্ষাৎপূর্বক এখানে কোন ফৌজ অবস্থান করছে কিনা জানতে চান। সরদার তাঁকে জানায়, এখানে তোমাদের ওপর আক্রমণ কররা মত কোন ফৌজ এসেছে বলে আমার জানা নেই। আমি যতদূর জানি, কিছুক্ষণ পূর্বে দু'জন গ্রাম্য লোক উটে চড়ে এদিক দিয়ে গেছে এবং যাওয়ার পথে এই কূপ থেকে পানি ভরে নিয়েছে। এছাড়া কোন নতুন তথ্য আমার জানা নেই। আবু সুফ্য়ান অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এগুতে থাকেন। সামান্য সামনে যেতেই উটের একটি তাজা লাদা দেখতে পান। আবু সুফ্য়ান সওয়ারী থেকে নেমে লাদাটি হাতে নিয়ে দেখেন ভেতরে খেজুরের বিচি। বিচি দেখতেই চিৎকার করে ওঠেন। কারণ, এ এলাকার উঠের লাদায় খেজুরের বিচি থাকার কথা নয়। মদীনার উটের লাদায়ই খেজুরের বিচি থাকে সাধারণত। তিনি ধরে নেন, নিশ্চয় কোন মুসলমান এপথে এসেছে। অতঃপর তীব্রবেগে কাফেলার কাছে এসে দ্রুত সমুদ্রের তীর পথে চলার আদেশ দেন। এবং কোন রকম বিরতি না দিয়ে একই মনযিলে দুই মনযিল পথ অতিক্রম করেন। এবং মুসলমানদের নাগালমুক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু এই বেঁচে যাবার সামান্য পূর্বে তিনি এক ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক দিয়ে মক্কায় পাঠান। তাকে এই মর্মে মক্কায় সংবাদ দিতে বলেন, শত্রুপক্ষ (হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) আমাদের ওপর আক্রমণ করছে। তোমাদের বাণিজ্য সম্পদ লুট হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং দ্রুত আমাদেরকে সাহায্য কর। লোকটি দ্রুত মক্কা গিয়ে সংবাদ পৌঁছে দেয়। এদিকে সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সাথে দুই মনযিল পথ অতিক্রম করার পর আবু সুফ্য়ান মক্কার উদ্দেশে আরেকজন নতুন দূত পাঠিয়ে এই মর্মে সংবাদ জানান, আমরা বেঁচে গেছি। তোমাদের আসার প্রয়োজন নেই। এদিকে আবু জাহেলের নেতৃত্বে মক্কার যুদ্ধবাজ সৈন্যরা বেরিয়ে পড়েছে। নতুন সংবাদ শুনে আবু জাহেল বলল, তারা আমাদের শত্রু। আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু তারা আমাদের ক্ষতি করবেই। এখন আমরা যথেষ্ট শক্তি নিয়ে বেরিয়েছি। সুতরাং পিছু হটার প্রয়োজন নেই। আমাদের উচিত তাদেরকে শেষ করে দেয়া।

এদিকে তিন দিন অপেক্ষা করার পর হযরত (সা.) জানতে পারলেন, আবু সুফ্য়ানের কাফেলা ভিন্নপথে চলে গেছে। তখন রাসূল (সা.) সঙ্গীদের সাথে পুনরায় পরামর্শ করলেন, আমাদের এখন কোথায় অবস্থান নেয়া উচিত। পরামর্শক্রমে কূপের দিকটায় অবস্থান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়, এখানে কূপ মাত্র একটি। তাই কূপটি যদি আমাদের দখলে থাকে তাহলে শত্রুপক্ষ স্বভাবতই পানি সংকটে পড়বে। এভাবে যুদ্ধকৌশলের দিক থেকে একটি উন্নত অবস্থানে থাকা যাবে। পরামর্শক্রমে অবস্থান পরিবর্তন হলো। কিছু সাহাবীর পরামর্শে পানি তুলে রাখার জন্য পাশেই আরেকটি গর্তও করা হল, যাতে যুদ্ধচলাকালীন কেউ তৃষ্ণার্ত হলে কূপ থেকে পানি ওঠাতে না হয়। কারণ, পানি ওঠাতে গেলে তখন শত্রু হামলা করে বসতে পারে। অধিকন্তু তারা যদি এখানে পানি নেয়ার জন্য আসে তাহলে তারা আমাদের কব্জায় চলে আসবে। মাত্র তিনশ বারজন সাহাবীসহ হযরত (সা.)-এর এই রণপ্রস্তুতি আজ আমাদের কাছে স্বাভাবিক মনে হলেও সেকালের সামরিক চিন্তায় এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবেই বিবেচিত। হযরত (সা.)-এর এতটুকু প্রস্তুতির সময়ই আবু জাহেলের নেতৃত্বে কুরাইশ বাহিনী বদরে এসে পৌঁছায়। হযরত (সা.) তখন শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা জানার জন্য একটি ক্ষুদ্র দল প্রেরণ করেন। তারা গিয়ে পানি নিতে আসা আবু জাহেলের দলের দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে। তখন রাসূল (সা.) নামায পড়ছিলেন। সিপাহিরা লোক দু'টিকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কে? তারা বলল, আমরা মক্কা থেকে আগত দলের লোক। তখন সিপাহিরা তাকে প্রহার করে এবং বলে, তোমরা আবু সুফ্য়ানের দলের লোক। তখন সে মারের ভয়ে বলে, হ্যাঁ আমি আবু সুফয়ানের দলের লোক। তারপর খানিকটা বিরতি দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে আমি মক্কা থেকে আগত ফৌজের লোক। রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন নামায থেকে অবসর হয়ে বললেন ঃ লোকগুলো যখন সত্য বলে তখন তোমরা তাদেরকে মারপিট কর

আর মিথ্যে বললে তখন ছেড়ে দাও! তারপর রাসূল (সা.) তাদের দিকে ফিরে বসলেন এবং তাদেরকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করলেন। এই কথাগুলোর মধ্যেও সামরিক বিচক্ষণতার ছাপ সুস্পষ্ট।

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের পরিচয়? তারা বলল, আমরা মক্কা থেকে আসা ফৌজের সদস্য। তোমরা সংখ্যায় কতজন? তারা বলল ঃ জানা নেই। তাদের সত্যিই জানা ছিল না। সুতরাং কীভাবে জানা যায়? এবার রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, খাবার জন্য তোমাদের কতটা উট জবাই করতে হয়? সে বলল ঃ কোনদিন নয়টি কোনদিন দশটি। রাসূল (সা.) সঙ্গে সঙ্গে এ থেকে আবিষ্কার করে নিলেন, তাহলে তাদের সংখ্যা নয়শ' থেকে এক হাজার। কারণ, সাধারণত একটি উট একশ' জনের এক দিনের খোরাক হতে পারে। আর প্রকৃত পক্ষে তখন তাদের সংখ্যা ছিল ৯৫০ জন। তারপর রাসূল (সা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ নেতাদের মধ্যে তোমাদের কে কে আছেন? তারা কিছু নেতার নাম বলল। এর দ্বারা হয়তো তিনি যুদ্ধে কারা নেতৃত্ব দেবেন সেটাই জানতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া তারা যেহেতু হুযূর (সা.)-এর স্বদেশী, সে কারণে তাদের নাম শুনে যুদ্ধে তারা কে কোথায় অবস্থান নেবে এটাও তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন। কারণ, সকালেই তো যুদ্ধ শুরু হবে।

চূড়ান্ত সংঘাত

রাতে রাসূল (সা.) সামান্য ঘুমিয়ে নেন। তারপর খুব ভোরেই ঘুম থেকে উঠে পড়েন। এবং তাঁর সামান্য ক্ষুদ্র ৩১২ সদস্যের বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেন। কারা দলের সম্মুখ ভাগে থাকবেন, কারা ডানে আর কারা বামে থাকবেন তিনি তা নির্ধারণ করে দেন। আগ-পিছ, ডান-বাম ও মধ্য দল মোট– পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলের প্রধান নির্বাচন করে দেন। এর বাইরে আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায়, যা হযরত (সা.)-এর সামরিক বিচক্ষণ্নতাকেই প্রমাণিত করে। এটা সুবিদিত, তিনি নবী ছিলেন। তাঁর হিফাযত করবেন মহান আল্লাহ এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপরও পৃথিবীর অন্য সব সত্যপন্থী সিপাহ্সালারদের শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে তিনি সামরিক কৌশল অবলম্বন করতেও ভুলেননি। তিনি ছোট একটি পাহাড়েরর উঁচুতে একটি ঝুপড়ি তৈরি করান, যেখানে বসে তিনি যুদ্ধ দেখাশোনা এবং পরিচালনা করবেন। ঝুপড়ি এ জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল যাতে শত্রু পক্ষের কোন তীর তাঁকে আক্রান্ত করতে না পারে। উঁচুতে এই জন্য স্থাপন করা হয়েছিলযাতে পক্ষ-বিপক্ষ সার্বিক অবস্থা তাঁর চোখের সামনে থাকে এবং প্রয়োজনমাফিক কোথাও সৈন্যসংখ্যা কমাতে-বাড়াতে হলে তা সঙ্গে সঙ্গেই করতে পারেন। অধিকন্তু তাঁর আদেশ যথা

সময়ে যথা স্থানে পৌঁছে দেয়ার জন্য দ্রুতগতিসম্পন্ন উটও সেখানে মোতায়েন করা হয়। ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন ঃ এই উট দুটি রাখার মূল লক্ষ ছিল– আল্লাহ না করুন– যদি মুসলমানদের পরাজয়ও হয়ে যায় তবুও যেন শত্রুপক্ষ হযরত (সা.)কে স্পর্শ করার সুযোগ না পায় বরং তিনি যেন সঙ্গে সঙ্গেই মদীনায় পৌঁছে যেতে পারেন। সুতরাং কত দূরদর্শিতা ও বিচক্ষনণতার সাথে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হযরত (সা.) তা সহজেই অনুমেয়।

শেষ কৌশল এবং ফলাফল

মুসলমানদের সংখ্যা ৩১২ আর কাফেরদের সংখ্যা ৯৫০। মুসলমানদের সর্বমোট ঘোড়া দু'টি। কাফেরদের ঘোড়া সংখ্যা একশ'র উপরে। এভাবে সকল দিক থেকেই শত্রুপক্ষ অধিক শক্তিশালী। এতটুকু কৌশল ও ব্যবস্থা গ্রহণের পর হযরত (সা.) স্বীয় ঝুপড়িতে চলে যান এবং আল্লাহ'র সামনে সিজদায় পড়ে কাঁদতে থাকনে। কেঁদে কেঁদে দু'আ করতে থাকেন। দু'আও হৃদয় কাঁপানো। তিনি হাত তুলে বলছিলেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও এই পৃথিবীতে তোমার ইবাদত বন্ধ হয়ে যাক তাহলে এই ক্ষুদ্র দলটিকে শেষ করে দাও, পরাজিত করে দাও। আর যদি তুমি চাও এই পৃথিবীতে তোমার ইবাদত হোক তাহলে এই ক্ষুদ্র দলটিকে বড় দলের উপর বিজয়ী করে দাও! এরপর তিনি ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন এবং মুসলিম বাহিনীকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ দেখ! আজ সারা পৃথিবীতে একমাত্র তোমরাই খোদার পক্ষের সৈনিক! আল্লাহ'র পতাকাবাহী তোমরা ছাড়া আর কেউ নেই। একথা শুনে তাদের ধমনীতে এক উষ্ণ শিহরণ খেলে যায়। তাদের চেতনায় প্রচণ্ডভাবে আন্দোলন ওঠে– আমরাই একমাত্র দল আল্লাহ'র পক্ষে লড়াই করছি! আল্লাহ'র জন্য লড়াই করছি। অবশিষ্ট সবাই আল্লাহ'র শত্রু। এই আবেগ, বিশ্বাস ও অনুভূতির উষ্ণ-উত্তাল তরঙ্গ তাদের এক একজনের ভেতর হাজার হাজার মানুষের শক্তি এনে দেয়। এখন জীবন নিয়ে খেলতে তাদের বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই। আর সে তো আজকালের মত নয়– যাদেরকে শরাব পান করিয়ে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করা হয়। কিন্তু এখানকার সব কিছুই আলাদা। এখানে তাদের হৃদয়ে একথা প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হয়েছিল, তোমরা যে উদ্দেশ্যে লড়াই করছো এটা পৃথিবীর সবচে' বড় উদ্দেশ্য। এর শেষফল কী হবে তা তো সবাই জানেন! এক মুঠো মানুষ এক বিশাল বাহিনীকে শুধু পরাস্তই করেনি বরং সত্তরজনকে হত্যা করেছে; সত্তরের বেশিজনকে বন্দি করেছে।

মালে গণীমত প্রসঙ্গে

এখন একটি নতুন প্রসঙ্গে যাচ্ছি। আর তাহলো যুদ্ধলব্ধ অর্থ বা গনীমতের সম্পদ। এটাও যেহেতু যুদ্ধেরই একটি নগদপ্রাপ্তি! তাই এ সম্পর্কে ইসলামের

আইন কী? এবং শত্রুপক্ষের লোকদের সাথে আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত?

বদরযুদ্ধের বন্দিদের সম্পর্কে যখন পরামর্শ তলব করা হলো তখন হযরত উমর (রা.) বললেন ঃ হে রাসূল! এরা আমাদের আদি শত্রু, চিরশত্রু। এরা দীর্ঘ পনের বছর পর্যন্ত আমাদেরকে আর্থিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করে আসছে। সুতরাং এখন ছেড়ে দিলেই তারা মুসলমান হয়ে যাবে, আমি এটা আদৌ মনে করি না। আমার মতে তাদেরকে এক্ষনি হত্যা করে ফেলা উচিত। হযরত আবু বকর (সা.) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মতে এদেরকে হত্যা না করে রক্তমূল্য নিয়ে ছেড়ে দিলেই ভাল হবে। তারা আমাদের শত্রু এটা সন্দেহাতীত। হতে পারে তাদের একজনও ইসলাম গ্রহণ করবে না। কিন্তু তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কেউ তো ইসলাম গ্রহণ করতে পারে! তাই তাদেরকে জীবিত রাখাটাই ভাল হবে মনে করি। অধিকন্তু আমাদের অর্থেরও প্রয়োজন আছে। তাই রক্তমূল্য নিলে আমাদের অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন হবে আর তারা হবে দুর্বল। যুদ্ধের ক্ষেত্রে এটাও আমাদের জন্য একটি লাভের দিক। হযরত (সা.) আবু বকর (রা.)-এর অভিমত গ্রহণ করেন। অবশ্য পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদেরকে ভর্ৎসা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

* لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ *

'যদি আল্লাহ কর্তৃক পূর্বসিদ্ধান্ত না থাকতো তাহলে তোমরা যা (রক্তমূল্য) গ্রহণ করেছ তার বিনিময়ে তোমাদের কঠিন শাস্তি হতো।' *(৬৮ ঃ ৮)*

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, কেন এভাবে ভর্ৎসা করা হলো? আমি মনে করি, যতক্ষণ পর্যন্ত পূববর্তী শরীয়তের কোন আইন বাতিল কিংবা পরিবর্তনমূলক কোন ওহী অবতীর্ণ না হবে ততক্ষণ তা মেনে চলা জরুরি। যেহেতু ইতিপূর্বে মুসলমানগণ কোন যুদ্ধ করেননি সেহেতু যুদ্ধ সম্পর্কে কোন পরিপূর্ণ বিধানও রাসূল (সা.) প্রাপ্ত হোননি। তাই পূর্ববর্তী শরীয়তগুলোর– যেমন তাওরাতের ওপর আমল করা হুযূর (সা.)-এর কর্তব্য ছিল। আর তাওরাতের একাধিক স্থানে এ কথার উল্লেখ আছে, যদি শত্রুর সাথে তোমাদের লড়াই বাধে এবং তোমরা বিজয়ী হও তাহলে পুরুষ, নারী, শিশু বৃদ্ধসহ সকল প্রাণীকে হত্যা করে ফেল। তাদের সম্পদও তোমরা নিয়ে নাও। সম্পদ সম্পর্কেও তাওরাতে একাধিক স্থানে বলা হয়েছে– এগুলো আল্লাহ'র সম্পদ! এগুলো জ্বালিয়ে দাও! এগুলো তোমরা ব্যবহার করবে না। যদিও রাসূল (সা.) স্বীয় স্বভাবজাত নম্রতা দয়া ও অনুগ্রহ বশতই এই বিধানের ওপর আমল করতে পারেন নি। তাছাড়া আল্লাহ তাআলাও তো হযরত (সা.)কে 'রাহমাতুল-লিল-আলামীন' সারা জাহানের রহমত খেতাবে ভূষিত করেছেন। কিন্তু তারপরও আল্লাহ তাঁর আইন রহিত না হওয়া পর্যন্ত তা

অমান্য করাকে পছন্দ করেননি। সে কারণেই সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এই আয়াতে। তবে কোনরূপ শাস্তি দেননি। কারণ, আল্লাহ নিজেই তো বলছেন– 'যদি সিদ্ধান্ত না থাকতো।" অর্থাৎ এই আইন যে পরিবর্তিত হবে এটা পূর্ব থেকেই কৃতসিদ্ধান্ত ছিল। আর মুসলমানগণ এই যুদ্ধে বেশ উপকৃত হয়েছিল। কারণ, এ সুযোগে তাঁরা লক্ষ লক্ষ টাকা পেয়েছে, মুশরিককরা হারিয়েছে লক্ষ লক্ষ। কারণ, প্রতি একজনের রক্তমূল্য ছিল একশ'টি উট। সর্বনিম্ন মূল্যের একটি উটের দাম হতো চল্লিশ দিরহাম। সুতরাং সত্তরজনের রক্তমূল্য কি পরিমাণে এসেছিল সহজেই অনুমেয়। যাদের কাছে অর্থ ছিল তারা অর্থ দিয়েছে। যারা ব্যবসায়ী ছিল– যেমন অস্ত্র ব্যবসায়ী। তারা অর্থের বদলে অস্ত্র দিয়েছে। আর তাই গ্রহণ করা হয়েছে। যাদের কাছে অর্থ ছিল না। গরিব ছিল। তারা তাদের বন্ধুদের কাছ থেক চাঁদা করে এই মূল্য আদায় করেছে। আবার এমন কয়েদিও ছিল যার অর্থও নেই, সাহায্য করার মত বন্ধুজনও নেই। কিন্তু তারা পড়া-লেখা জানতো। হযরত (সা.) তাদেরকে বলেছেন, তোমরা একশ' উঠের বদলে মুসলমানদের দশজন সন্তানকে লেখাপড়া শিখিয়ে দাও। তাহলেই তোমাদেরকে মুক্ত করে দেব। এর দ্বারা বিদ্যার জন্য হযরত (সা.) আগ্রহ ও গুরুত্বের বিষয়টিও প্রতিভাত হয়ে ওঠে। বন্দিদের মধ্যে এমন লোকও ছিল, যাদের অর্থ, বিদ্যা ও সাহয্যকারী কোনটিই ছিল না। তারা ভবিষ্যতে মুসলমানদের কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না এই শর্ত ও অঙ্গীকারের ভিত্তিতেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। আবার দেখা গেছে, কোন কবীলায় মুসলমান বন্দি আছে। সেই মুসলমানের মুক্তির বিনিময়েও কোন কোন কয়েদিকে মুক্তি দেয়া হয়। এভাবে যুদ্ধ সম্পর্কিত বেশ কিছু আইনি উপমা বদরযুদ্ধ থেকে আমরা লাভ করি। এবং মুসলমানদের International Law—আন্তর্জাতিক আইনও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বদরযুদ্ধ সম্পর্কে আমরা এ পর্যন্তই শেষ করছি।

ওহুদ যুদ্ধ

মক্কার লোকেরা পরাজিত হয়ে মক্কায় ফিরে আসে। কিন্তু সংশয় নিয়ে। তারা ভাবতে থাকে আমরা ঘটনাক্রমে পরাজিত হয়েছি। সুতরাং আমাদেরকে প্রতিশোধ নিতে হবে এবং সে জন্য প্রয়োজন প্রস্তুতি। শুরু হয় প্রস্তুতি। দীর্ঘ এক বছর কাল তারা কয়েক লক্ষ অর্থ ব্যয় করে বেশ বিছু বীরযোদ্ধা তৈরি করে। এ লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন স্থানে গিয়ে ঘোষণা করে। আমাদের ফৌজে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যে ব্যক্তি লড়াই করবে তাকে এত টাকা সম্মানী দেয়া হবে। আর যুদ্ধলব্ধ অর্থতো পাবেই। এক বছরকাল প্রস্তুতির পর তারা পুনরায় মদীনা অভিমুখে রওনা হয়। বদরযুদ্ধের সময় তাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল নয়শ' পঞ্চাশজন। এবার সৈন্যসংখ্যা

তিন হাজার। আর হাতিয়ার ধরতে সক্ষম মুসলিম মুজাহিদের সংখ্যা তখন এক হাজার মাত্র। এদের মধ্যেও তিনশ' ব্যক্তি চূড়ান্ত মুহূর্তে এসে দল ছেড়ে চক্রান্তমূলকভাবে সরে পড়ে।

মদীনা শরীফে ইসলাম আগমনের পূর্বেই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল নামের এক ব্যক্তি মদীনার প্রেসিডেন্ট হতে চেয়েছিল। অন্তত একটি গোত্রের লোক শহরের নেতৃত্বের তাজ তৈরির জন্য রীতিমত বায়নাও করে ফেলেছিল। ঠিক তখনই মদীনায় হযরত (সা.)-এর আগমন ঘটে। এবং তিনি তার রাজা হবার বিষয়টা খাতাভুক্ত করে যথারীতি রহিত করে দেন। সুতরাং এতে তার ভীষণ কষ্ট হয়েছিল– এটাই স্বাভাবিক। তাই তার জন্য আন্তরিকভাবে প্রসন্নচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করাটা কঠিন ছিল। ফলে সে ওহুদ যুদ্ধের সময় যে যুদ্ধের আলোচনায় এখন আমরা প্রবেশ করছি– সে প্রস্তাব করল, মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা আমাদের জন্য ঠিক হবে না। মদীনার ভেতরে থেকেই যুদ্ধ করাটা অধিক সংগত মনে হয়। প্রাথমিকভাবে হুযূর (সা.) তাই মনে করছিলেন। অবশেষে তিনি সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করলেন। এতে অধিকাংশ সাহাবী মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিলেন। সবিশেষ যুবক সাহাবীদের বার বার অনুরোধের প্রেক্ষিতে রাসূল (সা.)ও বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বলল ঃ এই লোক বাচ্চাদের কথা শুনে অথচা আমাদের মত প্রবীণ অভিজ্ঞ বুদ্ধিমানদের কথার পাত্তা দেয় না। এর সাথে চললে বিপদ হবে। অবশেষে সে তার তিনশত সহযোগীসহ মদীনায় চলে আসে।

প্রস্তুতি ও সৈন্যবিন্যাস

মোটকথা, মাত্র সাতশ' যোদ্ধা নিয়ে হযরত (সা.) তিন হাজার কুরাইশী যোদ্ধার বিরুদ্ধে লড়াই করতে এগিয়ে যান। যুদ্ধের মুহূর্তে মুসলিম ফৌজের অবস্থান কোথায় কোন পাহাড়ে হবে, পানির কোন ঝর্ণা কোনদিকে থাকবে তা কীভাবে ব্যবহার করা হবে– ইত্যাকার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ নেই। এর জন্য বিশাল সুযোগের প্রয়োজন। সংক্ষেপে এতটুকু বলি, যুদ্ধের সময় উহুদ পাহাড়ের কোলে যে স্থানটা মুসলমানদের অবস্থানের জন্য নির্বাচন করা হয় তা ছিল একটি নিরাপদ ও সংরক্ষিত স্থান। পাহাড়টি ধনুকের মত সামান্য বাঁকানো, ভেতরের দুদিকে দুটি বৃত্তের মত অবস্থা। ভেতরে প্রবেশের পথ খুবই সংকীর্ণ। ভেতরের এই প্রশস্ত ময়দানেই মুসলিম বাহিনী অবস্থান গ্রহণ করে। যুদ্ধের সময় তারা বাইরের দিকটায় বরং আর ও নীচে নেমে এসে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। অন্য স্থানে শত্রুপক্ষের অবস্থান। মুসলমানগণ যেখানে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধের

জন্যে অবস্থান নিয়েছিল সেখানে ছোট্ট একটি পাহাড় ছিল। জাবালুর-রুমাত-বা তীরান্দাজদের পাহাড়। এই অংশটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এখানে যদি আমাদের লোকের অবস্থান হয় তাহলে শত্রুপক্ষ আমাদের ওপর পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে পারবে না। তাই এখানে পঞ্চাশজন তীরান্দাজ নিযুক্ত করা হয়। মুসলমানদের মধ্যে সওয়ারী ছিল মাত্র দু'জন— হযরত আবু হুরায়রা, (রা.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)। তাঁদেরকে আদেশ করা হল, তোমরা এই জাবালুর রুমাতের পাশেই অবস্থান করবে। যদি শত্রুদের আরোহীদল এদিক থেকে আক্রমণের জন্য আসে তাহলে সকলে মিলে হামলা করবে।

যুদ্ধ ও ফলাফল

দেখা গেছে, হযরত (সা.)-এর অনুমান ঠিক হয়েছে। শত্রুপক্ষ তাদের পদাতিক বাহিনীকে ওহুদের সামনের ময়দানের দিকে অগ্রসর করেছে আর আরোহী বাহিনীকে খালিদ ইবনে ওলীদ এবং তার নিকটাত্মীয় ইকরিমা ইবনে আবু জাহেলের নেতৃত্বে ওহুদ পাহাড়ের পেছন দিক থেকে প্রায় দশ মাইল পথ চক্কর কেটে এসে পশ্চাৎ দিক থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা করার আদেশ করা হয়। তারপর শুরু হয় প্রচণ্ড যুদ্ধ। প্রথম ধাওয়ায়ই বিজয় এসে পড়ে মুসলমানদের হাতের মুঠোয়। শত্রুরা নারী-পুরুষ সমানে পালাতে থাকে। ঠিক এই মুহর্তেই শত্রুদের আরোহী বাহিনী পেছন দিক থেকে মুসলমানদের নিকটে এসে পৌছায় এবং একসাথে হামলা করে। মুসলমানদের দুই আরোহীসহ তীরন্দাজ বাহিনী একযোগে আক্রমণ করে শত্রুপক্ষকে পেছনে হটতে বাধ্য করে। জায়গাটি ছিল খুবই সংকীর্ণ। বাধ্য হয়ে খালিদ ইবনে ওলীদ পিছনে চলে যায়। একটুর পর পুনরায় আক্রমণ করে এবারও পিছপা হতে বাধ্য হয়। আমরা একটু আগে উল্লেখ করেছি, ময়দানের শত্রুপক্ষের পরাজয় হয়েছে। মুসলমান সিপাহিরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লুটে নিচ্ছে। এদিকে খালিদ ইবনে ওলীদের বাহিনীও পালিয়ে গেছে। তাই এই ক্ষুদ্র পাহাড়ে অবস্থানরত তীরান্দাজ বাহিনী চিন্তা করল আমাদের তো আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ নেই; বরং আমাদেরও গনীমতের সম্পদ সংগ্রহে অংশ নেয়া উচিত। অথচ তাঁদেরকে এখানে নিযুক্ত করার সময় হযরত (সা.) স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিলেন– যদি মুসলমানদের পরাজয় হয় এবং তাদের লাশগুলো গাধা দ্বারা দলিতও করা হয় তবুও তোমরা এ স্থান ত্যাগ করতে পারবে না। কিন্তু বিষয়টি তাঁরা ঠিকমত বুঝে উঠতে পারেননি। তাই দলনেতার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বেশ কিছু সিপাহি এই স্থান ত্যাগ করে ময়দানে চলে যায়। এই সুযোগে খালিদ ইবনে ওলীদ তৃতীয় বারের মত হামলা করে এবং

দলনেতা সহ আট-দশজনকে শহীদ করে আরোহী দল ভেতরে ঢুকে পড়ে পেছন দিক থেকে অতর্কিতভাবে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালায়। মুসলমানগণ গনীমতের সম্পদ সংগ্রহ করছেন। সামনে দিয়ে শত্রুদল ছোটাছুটি করছে। এদেখে পলায়নরত শত্রুপক্ষ তখন তাজ্জব হলো! ব্যাপার কি! ওরা আমাদের পশ্চাদ্ধাবন না করে পেছনে হটছে। তখন সেই পলায়নরত দল ফিরে দাঁড়ায় এবং পুনরায় মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে বসে। ফলে মুসলমানগণ অগ্র-পশ্চাৎ দুই দিক থেকেই আক্রমণের শিকার হোন। পরিণামে সত্তরজন মুসলমান শহীদ হয় এবং হযরত (সা.) আহত হোন। অনেক মুসলমান দৌড়ে পালায়। কেউ কেউ তো তিনদিনের পথ পার করে গিয়ে থেমে দাঁড়ায় আবার কেউ কেউ গিয়ে আশ্রয় নেয় পাহাড়ের চূড়ায়। এক কথায় মুসলমানরা তখন হেরে যান।

রাখে আল্লাহ মারে কে?

এখানে এসে এলাহী তাকদীর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কারণ, বাহ্যতঃ বিজয়ের পর কুরাইশদের উচিত ছিল, মদীনায় চলে যাওয়া। কারণ, সেখানে তো কোন পাহারাদার বাহিনী ছিল না। তাই সহজেই মদীনায় ঢুকে লুটপাট করতে পারত। শিশু ও নারীদেরকে বন্দি করে ফেলতে পারত। পদদলিত করতে পারতো বিজয়ের শেষ রেখা। কিন্তু তারা তা করেনি। হয়তো এটাই আল্লাহ'র মর্জি ছিল। তাছাড়া অন্য কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। শত্রুদলের প্রধান আবু সুফয়ান কত দূরদর্শী নেতা! বদর যুদ্ধে উটের লাদা থেকেই অনুমান করেছিলেন এটা মদীনার উটের লাদা। অথচ তিনিই এখন যুদ্ধের মাঠ পরিদর্শন করছেন। প্রিয় নবীজীর চাচা হামজা (রা.) শহীদ হয়েছেন। তাঁর বক্ষ চিরে কলজে বের করে আবু সুফয়ানের স্ত্রী চিবুচ্ছে, উল্লাস করছে। এটাও তার দৃষ্টির সামনে। সে এ কথাও বলে, আমি এমনটি করার নির্দেশ তো দিইনি। অর্থাৎ, মনে মনে খুশি। তখন তার দৃষ্টি পড়ে পাহাড়ের চূড়ায়। সেখানে দু'চারজন মুসলমান অবস্থান করছে। তখন সে চিৎকার করে বলে ঃ জয় হুবল! হুবলের জয়! আর তোমাদের পরাজয়।' এই চিৎকার হযরত উমরের কর্ণকেও ছুঁয়ে গেল। উমর (রা.) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা তো এই বলছে! হুযূর (সা.) বললেন ঃ জবাব দিও না। আবু সুফ্য়ান আবার চিৎকার করে বলল ঃ আবু বকর জীবিত আছে? উমর জীবিত আছে? যখন কোন উত্তর এল না তখন সে আশ্বস্ত হলো, আলহামদুলিল্লাহ! সকলেই মরে গেছে। তখন সে আবার বলল ঃ প্রশংসা হুবলের। এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না উমর! রাসূল (সা.)কে জিজ্ঞেস করা ছাড়াই জবাব দিয়ে বসলেন ঃ হে আল্লাহ'র দুশমন! আমরা সকলেই জীবিত আছি। রাসূল (সা.) জীবিত, আবু বকর জীবিত, উমরও জীবিত।

হযরত উমরের এই জবাব শোনার পর আবু সুফ্য়ানের কি করা উচিত ছিল? রাসূল (সা.)-এর সঙ্গে তখন খুব বেশি হলে আট-দশজন মানুষ। আবু সুফয়ানের সাথে বিশাল বাহিনী। ইচ্ছে করলেই উপরে উঠে সব শেষ করে দিতে পারতো। কিন্তু সে তা করেনি। বরং শুধু এইটুকু বলে– যুদ্ধ এমন একটি বিষয় কাল তোমাদের জয় হয়েছে তো আজ আমাদের। বদরে আমরা পরাজিত হয়েছিলাম আজ তার বদলা নিলাম। আমার পুত্র হানযালাকে হত্যা করা হয়েছিল আজ মুসলমানদের একজন বিশিষ্ট হানযালাকে মেরে ফেললাম– যার বাবা আবু আমের ছিলেন একজন বড় রাহিব। আগামী বছর আবার এই দিনেই তোমাদের সাথে লড়াই হবে। এখানে এই বিজয়কে কাজে না লাগানোটা আবু সুফয়ানের নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কি হতে পারে!

তারা যখন ফিরে যাচ্ছে তখন রাসূল (সা.) ভাবলেন, এরা হয়তো মদীনা আক্রমণ করতে যাচ্ছে। তাই তিনি মদীনা হেফাযতের কথা ভাবলেন! দু'জন সিপাহিকে ডেকে বললেন ঃ তোমরা দেখ এরা মক্কায় যাচ্ছে না মদীনায়। আর তা বুঝার উপায় হল, তারা যদি ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে থাকে তাহলে মনে করবে নিকটে কোথাও অর্থাৎ মদীনায় যাচ্ছে। আর ঘোড়া পেছনে রেখে যদি উটের উপর সওয়ার হয়ে রওনা হয়ে থাকে তাহলে মনে করবে দূরে কোথাও অর্থাৎ মক্কা যাচ্ছে। সিপাহি দু'জন একটু পরে এসে সংবাদ দিল, তারা উটে চরে যাচ্ছে। রাসূল (সা.) আশ্বস্ত হলেন এবং শহীদদের দাফন ও আহতদের শুশ্রূষায় লেগে গেলেন। অতঃপর মদীনায় ফিরে আসেন।

প্রিয়তম রাসূল (সা.) মদীনায় এসে সামরিক দূরদৃষ্টিতার ভিত্তিতে নতুন করে চিন্তা করেন, শত্রুপক্ষ হয়তো কিছুদূর যাবার পর মনে মনে লজ্জিত হবে এবং পুনরায় মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে ফিরে আসবে। তাই এখনি আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেয়া দরকার। এই ভেবে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা করে দিলেন, যারা ওহুদ যুদ্ধে শরিক হয়েছিল তারাই আবার যুদ্ধে যাবে মদীনার বাইরে। যারা ইতিপূর্বে যায়নি তারা এই কাফেলায় শরিক হতে পারবে না। কিন্তু এর কারণ কি ছিল, তা সামরিক বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারবেন। আমরা শুধু এতটুকু বুঝি, যারা ইতিপূর্বে শরিক ছিল তাদের ভেতর যে প্রতিশোধ স্পৃহা থাকবে অন্যদের মধ্যে তা থাকবে না।

হযরত (সা.) বেশ কিছু আহত সৈন্যসহ এই ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে শত্রুদের পেছনে পেছনে তিন দিনের পথ অতিক্রমণ করেন এবং এক জায়গায় অবস্থান নেন। এতক্ষণে আবু সুফয়ান চিন্তা করে, আমরা বড় ভুল করে ফেলেছি। এত বড় বিজয়টাকে কাজে লাগানো প্রয়োজন ছিল। আমাদের এক্ষুণি মদীনা আক্রমণ

করা উচিত। কিন্তু মদীনা অভিমুখে রওনা হবার পর সেও শুনতে পারল, হযরত (সা.) নতুন ফৌজসহ মদীনায় থেকে তাদের সাথে মোকাবিলার জন্য এদিকে অনেকদূর এসে পড়েছেন। একথা শুনে তার ভয় হল, একবার তো হেরেছি; এবার আবার কি হয়! আবু সুফ্য়ানের সাহস হলো না। সে মক্কায় চলে গেল। এটা ছিল ইসলামের দ্বিতীয় যুদ্ধ। এই লড়াইয়ে শত্রুপক্ষের জয়-পরাজয়, কোনটিই হয়নি। এরপরও এতে উল্লেখযোগ্য দুটি দিক আছে।

এক. মুসলমানদের এই পরাজয়ের প্রতিব্যবস্থা কি করা যায়? তাই রাসূল (সা.) গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন, মুসলমানদের ভেতরে কি করে আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করা যায়।

দুই. শত্রুপক্ষ ফিরে যাবার কারণে যে ফলাফল হাতে এসেছে তার ভিত্তিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খন্দকের যুদ্ধ ঃ পূর্বাভাস

তারপর এমন একটি ঘটনা ঘটে যে কারণে কুরাইশরা পুনরায় মদীনার ওপর হামলা করার সাহস পেয়ে গেল। ঘটনাটি ছিল এই, বদর যুদ্ধের পর মক্কার লোকেরা চলে গেলে মদীনারই একটি ইহুদী কবীলার সাথে মুসলমানদের লড়াই বেধে যায়। একইভাবে ওহুদ যুদ্ধের পর মক্কাবাসী চলে গেলে মদীনার আরেকটি ইহুদী গোষ্ঠীর সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ হয়ে যায়। তাদের প্রথম কবীলাটির নাম ছিল 'কাইনাকা' আর দ্বিতীয়টির নাম ছিল 'বনু নাযীর'। বনুনাযীর বেশি ধনী গোষ্ঠী ছিল। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তারা মদীনা থেকে উত্তরে প্রায় পাঁচ দিনের পথ অতিক্রম করে এক জায়গায় গিয়ে আবাস স্থাপন করে। অর্থের দাপটে তারা চিন্তা করল এর প্রতিশোধ নিতে হবে।

কিন্তু সরাসরি নিজেরা মোকাবিলা করার হিম্মৎ হলো না তাদের। তাই তারা মক্কাবাসীদের দূত পাঠিয়ে জানাল, তোমরা যদি মদীনায় আক্রমণ কর তাহলে আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করব। অধিকন্ত মক্কার সাথে চুক্তিবদ্ধ গোত্রগুলোকেও জানিয়ে দিল, তোমারাও যদি মদীনার উপর হামলা করতে চাও তাহলে আমরা তোমাদেরকে আর্থিক সাহায্য দেব। এবং ইহুদীদের বন্ধু গোত্রগুলোকেও বলে পাঠাল, তোমরাও যদি মদীনার বিরুদ্ধে মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও তাহলে আগামী মৌসুমে খায়বারের সমগ্র উৎপাদন সামগ্রী তোমাদের দিয়ে দেব। অর্থ ও হিংসার সমন্বয়ে প্রলুব্ধ ও ক্ষুব্ধ প্রায় বার হাজার যোদ্ধা মদীনার ওপর আক্রমণ করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। বিভিন্ন মাধ্যমে রাসূল (সা.) সব কিছুই জানলেন। পরামর্শ করলেন সাহাবয়ে কেরামের সাথে। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন, এবার মদীনার ভেতরে থেকেই যুদ্ধ করবেন।

এবার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার প্রতি মদীনাবাসীও চাপ দেয়নি। কিন্তু অবস্থা ছিল তখন খুবই নাজুক। প্রতি দিনই ভয়ংকর সংবাদ আসছিল। কোন কোন গোত্র তাদের সাথে যোগ দিচ্ছে সেই সংবাদ আসছিল। আর তখন বার হাজার যোদ্ধার সাথে লড়াই করার মত মুসলমানদের সৈন্য ছিল মাত্র পনের শ'র মত। শত্রুদের সৈন্যসংখ্যাও বেশি, অস্ত্র ও অর্থ সম্ভারও বিপুল। তাছাড়া তাদের পেছনেই রয়েছে সম্পদের স্বর্ণভূমি খায়বার।

হযরত সালমান ফারসীর পরামর্শ

এ অবস্থায় রাসূল (সা.) পরামর্শস্বরূপ হযরত সালমান ফারসী (রা.) থেকে জানতে পারেন, শত্রুপক্ষ যখন শক্তিশালী হয়, ইরানিরা তখন তাদের বসতির চারপাশে খন্দক খুঁড়ে রাখে– যাতে রাতে কিংবা দিনে শত্রুপক্ষ আকস্মিকভাবে হামলা করতে না পারে। এই পরামর্শের ভিত্তিতে হযরত (সা.) খন্দক খোঁড়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং মদীনার দু'চারজনকে সঙ্গে করে মদীনার চারপাশে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে আসেন। খোঁজ-খবর নিয়ে আসেন, কোন দিকে প্রতিরক্ষা জোরদার করা দরকার। কোন দিকে প্রাকৃতিক ভাবেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মওজুদ আছে ইত্যাদি। কোথায় খন্দক খুঁড়তে হবে তাও দেখে আসেন রাসূল (সা.)। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া হয় কর্মসূচীর। সকল সৈনিক ঝাঁপিয়ে পড়েন পরিখা খননে। রাসূল (সা.) ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কোথায় কিভাবে কতটুকু পরিখা খনন হবে তা চিহ্নিত করে দেন। এবং বাস্তবিক পক্ষেই আজ পর্যন্ত কোন অতি বড় জেনারেলের পক্ষেও পরিখা খননের জন্য এরচে অধিক উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা সম্ভব নয়। সময় ছিল খুবই সংকীর্ণ। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই শত্রুপক্ষ আসার পূর্বেই পরিখা খনন সমাপ্ত হয়।

পরিখাটি কেমন ছিল এ সম্পর্কে সামান্য কিছু বিবরণ দেয়া জরুরি মনে করছি। খন্দকটির প্রস্থ এতটুকু ছিল যে, একটি তেজস্বী ঘোড়ার পক্ষে লাফ দিয়ে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। গভীরতাও এতকুটু যে, কেউ এর নিচে পড়ে গেলে নিজে নিজেই বেরিয়ে আসা মুশকিল। পরিখা খনন সমাপ্ত আর শত্রু এসে হাজির। কিন্তু এই অভিনব পদ্ধতি দেখে তো তারা হতচকিত। মক্কাবাসী এবং তাদের সঙ্গী গ্রাম্য চাষা লোকেরা ইতিপূর্বে এই জাতীয় বাধার মুখে পড়েনি। তাই তারা থমকে যায়। কারণ এখন এপাশ থেকে তীর চালানো ছাড়া কোন উপায় নেই। খন্দকটি যে রেখার উপর করা হয়েছিল তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট টিলা ছিল, এই টিলাগুলো গিয়ে পরিখার সাথে মিশে গেছে। কিন্তু পরস্পর টিলাগুলোর মাঝে সামান্য শূন্য জায়াগাও আছে, যেখানে পরিখা খনন করা হয়নি। অবশ্য এসব স্থানে টিলার উপর মুসলমান সৈনিক মোতায়েন করা আছে। সেখান থেকে শত্রুদের সার্বিক আবস্থা দেখা যায়।

একটি ঘটনা এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ রণকৌশল

একদিনের একটি ঘটনা! এক সাহসী অশ্বারোহী শত্রু সেই শূন্যপথ দিয়ে– হয়তো টিলার উপর দিয়েই আকস্মিকভাবে উঠে এসে মুসলমানদের ক্যাম্পে ঢুকে পড়ে। কিন্তু ছিল একা। মুসলমান সৈন্যরা তাকে ধাওয়া করে। কিন্তু সে পালিয়ে যাবার সময় খন্দকে পড়ে যায় এবং মুসলমান সৈন্যগণ তাকে হত্যা করে ফেলেন।

এখানে আমরা হযরত (সা.)-এর কাছ থেকে যুদ্ধরীতির একটি নতুন দিক শিখতে পাই। হযরত (সা.)-এর মানবতাবাদী দয়ার্দ্রতায় ভরা যে দিক। নিহত এই সৈন্যটি ছিল শত্রুপক্ষের একজন গুরুত্বপূর্ণ লিডার। তাই সে নিহত হবার পর তারা রাসূল (সা.)-এর কাছে প্রস্তাব পাঠায়, নিহতের লাশটি দিয়ে দিন, আমরা এর বিনিময়ে একশ উট দিয়ে দেব। রাসূল (সা.) বলে দিলেন ঃ এমনিই নিয়ে যাও। আমাদের উটের প্রয়োজন নেই। নিশ্চয় হযরত (সা.)-এর এই প্রক্রিয়া তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। অন্তরে ইসলামের প্রতি উন্নত ধারণার সৃষ্টি করেছিল। এরপর আরও বিভিন্ন স্থানে হযরত (সা.) এমন অনেক উপমা স্থাপন করেছেন, শত্রুপক্ষকে সমূলে বিনাশ না করে এমনসব কৌশল অবলম্বন করেছেন যাতে তারা ভাবতে বাধ্য হয় এবং ইসলামের প্রতি আকর্ষণ খুঁজে পায়।

যুদ্ধের ফলাফল

কয়েক সপ্তাহ ধরে এই যুদ্ধ চলতে থাকে। এদিকে কুরাইশদের পথসম্বল ফুরিয়ে আসে। তারপর তারা খায়বার থেকে কিছু রসদ সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু মুসলমানগণ সদা সতর্ক ছিলেন। তাই একবার খায়বার থেকে আসা রসদপত্র মুসলমাগণ ছিনিয়ে নেন। ফলে নিঃস্ব হয়ে পড়ে কুরাইশ বাহিনী। তাই তারা যুদ্ধবিরতি দিয়ে মক্কায় ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে বাধ্য হয়।

আমাদের ঐতিহাসিকগণ সাধারণভাবে কুরাইশদের এই প্রত্যাবর্তনের কারণ হিসেবে মৌসুমিক সমস্যাকেই উল্লেখ করেছেন। কারণ, তখন প্রচণ্ড শীত ছিল। বাতাস এত প্রবল ছিল যে, কুরাইশী সৈন্যদের তাঁবু পর্যন্ত ভু-পাতিত করে ফেলেছিল। ফলে বাধ্য হয়েই আবু সুফয়ানকে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। কিন্তু আমি মনে করি শুধু মৌসুমিক প্রতিকূলতার কারণেই তারা প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হয়নি। কারণ আরও ছিল। খন্দকের লড়াই হয়েছিল শাওয়াল মাসে। আর একথা সকলেরই জানা, আরবরা ইসলামপূর্ব যুগে যিলকদ, যিলহজ, মহররম ও রজব মাসকে সম্মানিত মাস মনে করতো এবং এসব মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম মনে করতো। সুতরাং শাওয়ালের ক্রান্তিকালে এখন সেই সম্মানিত মাসও

সমাগত ছিল। তাই তাদের এই ধারণার সংরক্ষণও জরুরি ছিল। দ্বিতীয় আরেকটি সমস্যা ছিল, তারা এখানে অবস্থান করলে মক্কায় গিয়ে হজের মৌসুম পাবে না। এতে করে হজের মৌসুমকে কেন্দ্র করে সাধারণ লোকদের যে আর্থিক বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থাকে তাও এক বছরের জন্য ছুটে যাবে। এবং এই সুযোগ তাদের অদ্যাবধি আছে। আমি মনে করি মৌসুম-সমস্যার পাশাপাশি এই দুইটি সমস্যাও যথেষ্ট কার্যকর ছিল।

ইহুদীদের চক্রান্ত ও তার প্রতিরোধ কৌশল

তাদের ফিরে যাওয়া ছাড়া যখন কোন পথই ছিল না, তখন তারা সর্বশেষ আরেকটি কৌশল চালাল। সম্ভবত খায়বারের ইহুদীরাই তাদেরকে এ ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছিল। কেননা, খায়বারের ইহুদীরা যখন জানতে পারল, বার হাজার সৈন্যের উপস্থিতি সত্ত্বেও কুরাইশরা ব্যর্থ তখন তাদের একজন অতি সন্তর্পণে-গোপনে মদীনায় ঢুকে পড়ে এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে। তখন তার মাথায় একটি উপায় খেলে যায়। সে চিন্তা করে, মদীনার ভেতর এখনও একটি ইহুদী গোত্র আছে। বনূ কুরাইজা। এবং মুসলমানরাও এদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত। তাদেরকে যদি দলে আনা যায় এবং তারা যদি ভেতর থেকে এবং পেছন থেকে হামলা করে আর বাইরে যদি কুরাইশরা আক্রমণ চালায় তাহলে তাদের কোন পালাবার পথ থাকবে না।

অবশেষে বনূ নাযীরের এই সরদার বনূ কুরাইজাকে গিয়ে উৎসাহ দেয়, লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করে। এবং এই সংবাদ রাসূল (সা.)-এর কানেও আসে। তখন রাসূল (সা.) তাঁর সামরিক বিচক্ষন্নতা ও অসাধারণ মেধা-দীপ্তির আলোকে এই চক্রান্ত প্রতিহত করতে সচেষ্ট হোন।

তিনি (সা.) এমন একজন নওমুসলিমকে একাজের জন্য নির্বাচন করেন যার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি এখনও অপ্রকাশিত। সকলেই তাকে অমুসলিম মনে করে। তাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এক কঠিন মিশনের দায়িত্ব দেন। সেমতে সে প্রথমে বনূ কুরাইজার কাছে গিয়ে বলে ঃ দেখ, কুরাইশরা যদি তোমাদেরকে এদিক থেকে আক্রমণ করতে বলে তাহলে তোমাদের প্রথমেই আশ্বস্ত হতে হবে পরে আবার তারা তোমাদেরকে একা ফেলে যাবে না। কারণ, যুদ্ধ শেষে মক্কাবাসী চলে গেলেতো তোমরা এখানে একা। তখন তোমরা মুহাম্মদের (সা.) সাথে লড়াই করে টিকতে পারবে না। সুতরাং তোমরা দাবি করবে, তোমাদের কিছু নেতাপর্যায়ের লোক আমাদের কাছে সোপর্দ করে দাও, যাতে আমরা নিশ্চিত হতে পারি, শেষ পর্যন্ত তোমরা আমাদের ফেলে চলে যাবে না। তারা বলল ঃ তুমিতো ঠিকই বলেছ। এখানে কথাবার্তা শেষ করে সে কুরাইশদের ক্যাম্পে যায়

সে তাদের পরিচিত লোক। গিয়েই বলে, তোমরা তো আমাকে চেনই। আমি তোমাদের বন্ধু মানুষ। আমি জানতে পারলাম, বনূ কুরাইজার ইহুদীগোষ্ঠী আর মুহাম্মদের (সা.) সাথে আপোস-রফা হয়ে গেছে। তাই তারা চাচ্ছে, কয়েকজন কুরাইশ নেতা কব্জায় এনে মুহাম্মদের হাতে তুলে দিতে। ঠিক এই মুহূর্তে এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে হযরত (সা.)কে এই সংবাদ শোনায়। তখন রাসূল (সা.) খুবই অর্থপূর্ণ একটি বাক্য শোনান। তিনি বলেন—

لَعَلَّنَا أَمَرْنَاهُمْ بِذَاكَ

'হতে পারে, আমরা তাদেরকে একথা বলেছি।'

এই দরবারে তখন মুশরিকদের একজন গুপ্তচর ছিল, সে তখন ছুটে যায় আবু সুফ্য়ানের কাছে। গিয়ে বলে, আমি এই মাত্র মুহাম্মদকে বলতে শুনলাম, সেই নাকি বনূ কুরাইজাকে একথা বলেছে! তারপর যখন কুরাইশদের প্রতিনিধি বনূ কুরাইজার কাছে যায় তখন তারা দু'টি শর্ত পেশ করে। ১. জামানত হিসেবে কয়েকজন নেতাকে তাদের কাছে সোপর্দ করতে হবে। ২. শনিবারে যুদ্ধ হবে না। কারণ, এ দিনে আমাদের ধর্মে যুদ্ধ করা হারাম। স্বাভাবিকভাবেই এসব শর্তে একমত হতে পারেনি কুরাইশরা। তাই এখানেই এই চক্রান্তের ইতি ঘটে। এবং এভাবেই অতি কৌশলে শেষ দিন পর্যন্ত মদীনার উত্তরে-দক্ষিণে সম্ভব্যে যুদ্ধের সকল পথ প্রতিরোধ করা হয়। তখন কুরাইশরা তাদের বন্ধুদেরসহ চূড়ান্ত ব্যর্থতা সহ মক্কায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়। তখন রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, এটাই ছিল কুরাইশদের শেষ চেষ্টা। এখন থেকে ভবিষ্যতে সূচনা Initiative আমাদের হাতে হবে। এবং আমরাই নির্ধারণ করব—যুদ্ধ কার সাথে করব এবং কখন করব।

কুরাইশরা প্রাথমিক পর্যায়ে দু'বার পরাজিত হবার পর ইহুদী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের উস্কানিতে তৃতীয়বারের মতো মদীনা আক্রমণ করল। কিন্তু এবারও মেনে নিতে হলো নৈরাশ্যজনক পরাজয়। ঘেরাও প্রত্যাহার পূবর্ক সলজ্জ বিদায় নিতে হলো। অতঃপর হযরত (সা.) পরিষ্কার ভাষায় ভবিষ্যদ্বাণী করে দিলেন, এখন থেকে আর শত্রুপক্ষ সূচনা করতে পারবে না। এখন সূচনা করব। অর্থাৎ এখন থেকে আর প্রতিঘাত নয়-আমরা আঘাত করব। রাসূল (সা.) বুঝতে পেরেছিলেন, কুরাইশরা মদীনার ওপর আরেকবার হামলা করার সাহস পাবে না। তাই এখন এই বিরতিকালটাকে কাজে লাগাতে হবে। তাই তিনি বেশ কিছু কৌশল অবলম্বন করেন। এগুলোর সম্পর্ক সরাসরি ফৌজ ও যুদ্ধের সাথে না হলেও পরোক্ষভাবে ফৌজী কর্মকাণ্ডের ওপর এর শক্ত প্রভাব পড়ে।

এই বিরতিকালেই আরবে একটা বড় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষ মক্কাকে খুব শক্তভাবে নাড়া দিয়ে যায়। কারণ, মক্কায় তো কোন কৃষি-খামার নেই।

তাদেরকে খাদ্য সংগ্রহ করতে হয় অন্যত্র থেকে। কিন্তু যেসব স্থান থেকে খাদ্য আমদানী করা হয় সেখানেও দুর্ভিক্ষ থাবা মেরেছে। তাই সেখান থেকেও খাদ্য সংগ্রহ করা যাচ্ছিল না।

কঠিন এই সময়ে ঘটে যায় আরেকটি ক্ষুদ্র অথচ চমৎকার ঘটনা। ফৌজী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি বেশ প্রভাবসম্পন্ন। মক্কাবাসীদের এই দুর্দিনে খাদ্য সংগ্রহের একমাত্র ভরসা হয়ে দাঁড়ায় নজদ। কারণ, দুর্ভিক্ষ নজদকে আঘাত করেনি। কিন্তু ঠিক এই সময়ে মুসলমানদের একটি ফৌজীদল কোথাও অবস্থান করতেছিল। তখন সন্দেহজনক অবস্থায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে মদীনায় নিয়ে আসে। লোকটিকে রাসূল (সা.) ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। নাম তার ছুমামা ইবনে আছাল। হিজরতের পূর্বে সে একবার মক্কায় এসেছিল। নজদের খুবই প্রভাশালী নেতা। রাসূল (সা.) তাকে দাওয়াত দিলেন। সে এতে ক্ষুব্ধ হয়ে রাসূল (সা.)কে ধমক দিয়ে বলে ঃ মুহাম্মদ চুপ কর! নইলে আমি তোমাকে জীবনে মেরে ফেলব। সেই নেতাই এখন বন্দি হয়ে এসেছে হযরতের দরবারে। রাসূল (সা.) এবারও তাকে বললেন ঃ কী, এখনও বেদ্বীনী ছেড়ে স্বীয় প্রভুর পথে আসার সময় হয় নি? তখন বলল ঃ মুহাম্মদ! যদি রক্তমূল্য চাও, তাহলে যত সম্পদ চাও দিতে প্রস্তুত আছি। আমি ধনী মানুষ। আর যদি হত্যা করতে চাও তাও করতে পার! একথার পর রাসূল (সা.) তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার নির্দেশ দেন। উদ্দেশ্য, যাতে সে মুসলমানদের জীবন-যাপন এবং ইবাদত বন্দেগী স্বচক্ষে দেখতে পারে। তাকে সময়মত খানা-পিনা দেয়া হতো। সে একাই দশ-বারজনের খাবার খেত। তাকে সে পরিমাণেই খানা দেয়া হতো। প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারারও সুযোগ দেয়া হতো। অতঃপর অবশিষ্ট সময় মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হতো। রাসূল (সা.) প্রতি নামাযের সময় তার পাশ দিয়ে যেতেন এবং ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতেন। উত্তরে সে একই কথা বলতো। চাইলে মুক্তিপণ দিতে পারি আর মেরে ফেলতে চাইলে তাও পার! অনেকবার এরূপ উত্তর শোনার পর রাসূল (সা.) বললেন ঃ যাও, আমি তোমাকে বিনাপণেই ছেড়ে দিলাম।

বিনা অর্থে ছেড়ে দিবে এমনটি সে কল্পনাও করেনি। তাই বিষয়টি ছিল তার কাছে অভাবনীয়। সে এই অনুগ্রহ ও আন্তরিকতায় খুব প্রভাবিত হয়। মসজিদ থেকে বেরিয়ে নিকটস্থ একটি কূপের ধারে গিয়ে গোসল করে এবং মসজিদে নববীতে ফিরে এসে হুযূর (সা.)-এর সামনে ঘোষণা দেয়- আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ। সাথে সাথে সে একথাও বলে, হে রাসূল! কয়েক মিনিট পূর্বে এই পৃথিবীতে আমার চোখে সর্বাধিক ঘৃণিত ব্যক্তি ছিলেন আপনি আর এখন এই ত্রিভুবনে আপনার চেয়ে প্রিয়

আমার দৃষ্টিতে আর কেউ নেই। অতঃপর সে একটি কথা বলে, আমাদের সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে বলে ঃ হে রাসূল! আমার দেশ থেকেই মক্কায় খাদ্য সামগ্রী আমদানি করা হয়। খোদার কসম! আপনি আমাকে হুকুম না দেয়া পর্যন্ত আমার দেশ-নজদ থেকে একটি শস্যদানাও মক্কায় নিতে দেব না। সে করেও তাই। খাদ্য বন্ধের এই হুমকি মক্কার জন্য আরও ভয়ানক পরিস্থিতি ডেকে আনে। তখন মক্কাবাসী বাধ্য হয়, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সমীপে এই মর্মে অনুরোধ জানাতে– "হে মুহাম্মদ! আপনিতো সর্বদাই মানুষকে সৎকর্ম দয়া-অনুগ্রহ এবং ভালোবাসার শিক্ষা দেন। এখন আপনি আপনার স্বীয় শহর ও স্বদেশীদের প্রতি অনুগ্রহ করুন! আমরা ক্ষুধায় মারা যেতে বসেছি।" তাদের এই অনুরোধ পাওয়ার সাথে সাথেই হযরত (সা.) খাদ্য বন্ধের আদেশ প্রত্যাহার করার আদেশ দিয়ে চিঠি লেখেন। এতে করে মক্কাবাসীরা ইসলামের প্রতি দুর্বল হওয়াই স্বাভাবিক ছিল এবং হযরত (সা.)-এর উদ্দেশ্যও ছিল তাই। অবশ্য তিনি এতটুকু করেই ক্ষান্ত হোননি। অতিরিক্ত মদীনা থেকে পাঁচশত আশরাফী যা কিনা সে আমলে একটি বড় অংকের মুদ্রা বলে বিবেচিত ছিল– মক্কাবাসীর নামে পাঠিয়ে দেন। দুর্ভিক্ষের সময় সবছুির দরই অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছিল। যে কারণে, গরিব লোকদের জন্য সম্ভব ছিল না, খাবার ক্রয় করা। তাই রাসূল (সা.) পাঁচশত আশরাফী মক্কার নেতা আবূ সুফ্য়ানের কাছে এই বলে পাঠান– 'এটা মক্কার অসহায় গরিব মানুষদের সাহায্যের জন্যে।" আবু সুফ্য়ান এতে ক্ষুব্ধ হয়। মন্তব্য করে, 'মুহাম্মদ আমাদের যুবক সম্প্রদায়কে ক্ষেপাতে চায়'। সে যাই হোক। অবস্থা ছিল খুবই নাজুক। তাই অর্থগুলো ফেরৎ পাঠাবার মত সুযোগ আবু সুফয়ানের ছিল না।

এরপর আরও এমন কিছু ঘটনা ঘটে যায়, যেসব কারণে মক্কার লোকেরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে শত্রু মনে করার পরিবর্তে অন্তরে অন্তরে তাকে নিয়ে গর্ববোধ করতে থাকে। মনে মনে অহংকার করতে থাকে, আমাদেরই সন্তান এখন মদীনার বাদশাহ্! এক শক্তিশালী প্রেসিডেন্ট! কিন্তু একথা মুখে আনার সাহস তাদের ছিল না। ভেতরটা তাদের ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। ভেতরের অবস্থা ছিল একান্তই নমিত। আই এই মুহূর্তে মক্কার ওপর যদি নবীজী (সা.) হামলা করেন তাহলে তারা পুরোপুরিভাবে তা প্রতিহত করতে পারবে না। কারণ, কেন তারা এই হামলা প্রতিহত করবে? মুহাম্মদ (সা.) কি তাদের শত্রু? তিনি তো বিপদে তাদেরকে সাহায্য করেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধি এবং মক্কা বিজয়

এমতাবস্থায় হযরত (সা.) তার অভ্যাসের খেলাফ ঘোষণা করে দেন, আমি মক্কায় যাব উমরা করতে। রাসূল (সা.)-এর সাধারণ অভ্যাস ছিল, কোথাও যুদ্ধে

গেলে কাউকে বলতেন না, কোথায় যাবেন, কোন পথে যাবেন। যাতে শত্রুপক্ষ কিছুই জানতে না পারে। কিন্তু এবার পরিষ্কার ঘোষণা করে দিলেন। তখনও হজের এক মাস বাকি। রাসূলুল্লাহ (সা.) রওয়ানা হবার পর জানতে পারলেন, পথেই মক্কার সাথে চুক্তিবদ্ধ একটি গোত্র 'আহাবিশ' যুদ্ধের তৈরি নিচ্ছে। তারা মক্কা গিয়ে মক্কাবাসীর পক্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। রাসূল (সা.) ফৌজী পরামর্শ সভা ডাকলেন। এই মুহূর্তে কি করা উচিত—অবস্থার বিবরণ দিয়ে সকলের পরামর্শ চাইলেন। তিনি এও বললেন ঃ আচ্ছা, আমরা কি প্রথমেই এদের ওপর হামলা করে তাদেরকে তছনছ করে দিতে পারি না, যাতে তারা শত্রুদের সাহায্য করতে না পারে! হযরত আবু বকর (রা.) তখন বললেন ঃ আমরা তো উমরা করার ঘোষণা দিয়ে ফেলেছি। সুতরাং আমাদের কোন রকম যুদ্ধে না জড়ানোটাই সমীচীন মনে করছি। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। রাসূল (সা.) এই মতকেই গ্রহণ করেন এবং মক্কার উদ্দেশে রওনা হয়ে যান।

মক্কার ভৌগোলিক অবস্থা হল, জিদ্দা থেকে সামান্য দূর পর্যন্ত খোলা মাঠ তারপর মক্কা পর্যন্ত উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে সরুপথ। আর যে স্থানটায় খুব গুরুত্বপূর্ণ কুদরতী সমস্যাবলীর সূচনা হচ্ছিল সেই স্থানটার নাম হুদাইবিয়া। আজকাল এটাকে শুমাইসা বলা হয়। মুসলমানগণ হুদাইবিয়ায় গিয়ে পৌছেন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, হযরত (সা.) যখন উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা সফরের ঘোষণা দেন তখন কেবল তরবারি ছাড়া অন্যকোন যুদ্ধাস্ত্র সঙ্গে নিতে নিষেধ করেন। আর তরবারি তো কোন যুদ্ধের অস্ত্র নয়। এটা তো ব্যক্তি নিরাপত্তার জন্য সকলেই সঙ্গে রাখে। কিন্তু কিছুদূর আসার পর রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করেন, আমরাতো উমরার উদ্দেশেই যাচ্ছি। কিন্তু যাচ্ছি তো শত্রুদের এলাকায়। সুতরাং যুদ্ধের সামানপত্র সঙ্গে থাকা উচিত, যাতে তারা আক্রমণ করলে আমরা অন্তত প্রতিহত করতে পারি। অবশেষে পরামর্শক্রমে অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয় এবং কাফেলা সেখানেই দাঁড় করিয়ে মদীনা থেকে অস্ত্র-শস্ত্র আনিয়ে নেন। সাথে এও সিদ্ধান্ত হয়, আমাদের এই যুদ্ধ সামগ্রী বদ্ধ অবস্থায় থাকবে। একান্ত প্রয়োজনের সময়ই তা ব্যবহার করা হবে।

হুদাইবিয়া পৌছার পর রাসূল (সা.) মক্কায় একজন দূত পাঠান। উদ্দেশ্য, মক্কাবাসীকে এই মর্মে আশ্বস্ত করা, আমরা লড়াই করতে আসিনি। উমরা করতে এসেছি। তোমাদের ইবাদতখানা যিয়ারত করতে এসেছি। কারণ, তখন কা'বা মুশরিকদের দখলেই ছিল। সেখানে মূর্তি-ভজন হতো। এই উদ্দেশ্যে হযরত উসমান (রা.)কে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হলো। অবশ্য একথাও বলে রাখা প্রয়োজন। মক্কার প্রশাসনিক বিধান মতে প্রত্যেক কাজের জন্যই একজন মন্ত্রী বা দায়িত্বশীল

ব্যক্তি ছিল। সেমতে হযরত উমর (রা.) ছিলেন তাদের মধ্যে দূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। সে হিসেবে তিনি তাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তাই রাসূল (সা.) চিন্তা করলেন, মক্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী যখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন তখন ইসলামের তথা মদীনার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে মক্কার নেতাদের সাথে কথার্বার্তায় বসার জন্য দূত হিসেবে তাকেই পাঠাবেন। কিন্তু উমর (রা.) এই বলে আশংকা প্রকাশ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলাম গ্রহণের মুহূর্ত থেকেই আমি তাদের কঠিন শত্রু হিসেবে চিহ্নিত। তাই আমাকে হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হত্যা করে ফেলতে পারে। আমি মনে করি, যদি উসমান (রা.)কে পাঠান তাহলে তারা তুলনামূলক ভাল আচরণ করবে। কারণ, তিনি বনূ উমাইয়ার লোক। আর বনূ উমাইয়ার লোকেরা এখনও মক্কায় অবস্থানরত। রাসূল (সা.) তাঁর যুক্তিকে পছন্দ করলেন এবং হযরত উসমান (রা.) কেই দূত করে পাঠালেন। অবশ্য উসমান (রা.) সেখানে যেতেই তাঁকে বন্দি করে ফেলা হয় আর এদিকে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে, তাঁকে হত্যা করে ফেলা হয়েছে।

হযরত উসমান (রা.)'র শাহাদাতের সংবাদ মুসলিম ক্যাম্পে এসে পৌঁছলে হযরত (সা.) বাধ্য হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এবং সকল মুসলমানকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন ঃ আমরাতো উমরা করতে এসেছিলাম। কিন্তু শত্রুরা আমাদের দূতকে হত্যা করেছে। কাজেই বাধ্য হয়ে এখন আমাদেরও যুদ্ধ করতে হবে। সুতরাং তোমরা শপথ কর, আমাদের জীবন থাকতে এবং শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে যাব না। এই শপথের নামই 'বাইআতে রিদওয়ান'। যে গাছের তলায় হযরত (সা.) এই শপথ নিয়েছিলেন সে গাছও আল্লাহ'র দরবারে এতটা সম্মানিত হয়ে গেছে পবিত্র কুরআনে তার আলোচনা হয়েছে-- اَلَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

"যাঁরা গাছের তলে তোমার হাতে শপথ নিয়েছে----' (৪৮ ১৮)

এদিকে হযরত (সা.)-এর এই প্রস্তুতির কথাও মক্কায় পৌঁছে যায়। এতে তারাও ঘাবড়ে যায়। তখন তারা মক্কার সাথে চুক্তিবদ্ধ কবীলার একজন লোককে দূত বানিয়ে পাঠায় রাসূল (সা.)-এর সাথে কথা বলার জন্য। সে অশিক্ষিত গেঁয়ো লোক ছিল। তবে ছিল বুদ্ধিমান। তাই রাসূল (সা.) আদেশ করেন, তাকে নিয়ে কুরবানীর পশুগুলো দেখাবার জন্য। যাতে তার বিশ্বাস হয়, মুসলমানরা যুদ্ধ করতে আসেনি। উমরা করতে এসেছে।

সে যুগে কুরবানীর পশুকে বিভিন্নভাবে চিহ্নিত করে রাখা হতো। তাই দূত পশুগুলো দেখেই বুঝতে পারে, এঁরা যুদ্ধের জন্য আসেনি। এজন্যে তাকে খুব দীর্ঘ আলোচনা করতে হয়নি। সে সঙ্গে সঙ্গেই মক্কায় গিয়ে বলে দেয়, এঁরা উমরা করতেই এসেছে। যুদ্ধ করতে আসেনি। সুতরাং তোমরা তাদের সাথে অযথা

লড়াই করো না। নইলে আমরা তোমাদের সাথে থাকব না। এতে তারা বেশ প্রভাবিত হয় এবং হযরত (সা.)-এর জীবনসঙ্গিনী হযরত সাওদার (রা.) চাচাতো ভাই সুহাইল ইবনে আমরকে আলোচনার জন্য পাঠায়। সেও খুব বুদ্ধিমান এবং শালীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে এবং সন্ধির শর্তাবলী চূড়ান্ত করা হয়। শর্তগুলো স্থুলদৃষ্টিতে মুসলমানদের বিপক্ষেই মনে হচ্ছিল। যেমন সেখানে উল্লেখ ছিল এই সন্ধির মেয়াদ হবে দশ বছর। এই দশ বছর সন্ধি-চুক্তি কালে যদি কোন মুসলমান মদীনা ছেড়ে মক্কায় চলে আসে তাহলে আমরা তাকে ফেরত দেব না। কিন্তু যদি মক্কার কোন লোক মদীনায় চলে যায় আর আমরা দাবি করি তাহলে তাকে ফেরত দিতে হবে। এতে বাহ্যত মুসলমানদের জন্য অপমান ও দুর্বলতা প্রকাশ পেলেও রাসূল (সা.) তা মেনে নেন। তখন রাসূল (সা.) এও বলেন ঃ আমি সন্ধি করার জন্য এসেছি। তাই মক্কাবাসী যা চায় আমি তাই দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এটা কেন! এরও কোন কারণ ছিল নিশ্চয়।

মুসলিম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ফকীহ্ শামসুল আইম্মা সারাখসী (রহঃ) তাঁর কিতাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলেছেন, যা আমি কোন সীরাত গ্রন্থেও পড়িনি। তিনি লিখেছেন, যদি মানচিত্রের দিকে তাকাও তাহলে দেখবে, মক্কা মদীনা থেকে দক্ষিণে আর খাইবার মদীনা থেকে উত্তরে। মদীনা এই দুই শত্রুদেশের মাঝখানে। অথচ এই দুই শত্রুদেশের মধ্যে পরস্পর চুক্তি করা আছে, যদি মুসলমানগণ এদের যে কোন দেশের প্রতি অগ্রসর হয় তাহলে অপর দেশ মদীনার ওপর হামলা করবে। অথচ এদের এক দেশের প্রতি যখন মুসলমানগণ অগ্রসর হবেন তখন স্বাভাবিকভাবেই মদীনা থাকবে উন্মুক্ত- প্রতিরক্ষাশক্তিশূন্য। এমতাবস্থায় অপর শত্রুপক্ষ ভেতরে ঢুকে সবকিছু তছনছ করে দেবে খুব সহজেই। সে কারণে একজন বিজ্ঞ দূরদর্শী কমান্ডার হিসেবে রাসূর (সা.) চিন্তা করেছিলেন, এখন প্রধান কাজ হলো, এদের যে কোন এক দলের সাথে চুক্তি করে তাদের পরস্পরকে আলাদা করে ফেলা। আর সে কারণেই শত্রুপক্ষের দেয়া সকল শর্তই তিনি মেনে নিয়েছিলেন। অধিকন্তু এটাও ভাববার ছিল, চুক্তি কার সাথে হবে— মক্কার সাথে না খাইবারের সাথে? খাইবারের ইহুদীদেরকে যেহেতু মদীনা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, তাই তাদের সাথে চুক্তি হবার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, তারা হয়তো প্রথমেই এই শর্ত দিয়ে বসতো, আমাদেকে পুনরায় মদীনায় ফিরিয়ে নেয়া হোক। আর শত্রুকে ঘরে তোলার অর্থ হয় না। তাছাড়া মক্কায় যারা আছে তারা সবাই রাসূল (সা.) এবং মুহাজিরগণের আত্মীয়-স্বজন। কারও ভাই, কারও ভাতিজা, কারও চাচা। সুতরাং ইহুদীদের সাথে চুক্তি করে মক্কার আপনজনকে মারার চেয়ে তাদের সাথে চুক্তি করে ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করাটাই অধিক যুক্তিসঙ্গত ছিল। অধিকন্তু ইতিপূর্বে তিনতিনটি যুদ্ধে

পরাজিত হওয়ার কারণে মক্কার লোকদের অর্থনৈতিক সংকটও ছিল প্রকট। তাই তারা সহজেই সন্ধি করতে প্রস্তুত ছিল। তবে তারা তাদের স্বভাবজাত অহংকার বশত কিছু উঁচু মাত্রার শর্ত জুড়ে দিয়েছে, যাতে অন্যদের সাথে বলতে পারে, আমরা নত হয়ে চুক্তি করিনি।

চুক্তিপত্রের শর্তগুলোর মধ্যে একটি শর্ত ছিল—

لَا اَسْلَالَ وَاَغْلَالَ

অর্থাৎ– হাতিয়ার কোষমুক্ত করা যাবে না এবং কোনরূপ ধোঁকাবাজি করা যাবে না। এর অর্থ হল, মুসলমানগণ এবং মক্কাবাসী এমর্মে অঙ্গীকার করছে, আমরা একে অন্যের সাথে লড়াইও করব না এবং গোপনেও ধোঁকাবাজিমূলকভাবে এই চুক্তির বিপরীত কিছু করব না। ভিন্ন শব্দে একথাও বলা যায়, এই অঙ্গীকারের মর্ম ছিল, মুসলমানদের যদি তৃতীয় কোন দলের সাথে লড়াই হয় তাহলে মক্কাবাসী নীরব থাকবে, নিরপেক্ষ থাকবে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে গাদ্দারী করতে পারবে না। মূলত এই একটি শর্তের কারণেই হযরত (সা.) তাদের সকল শর্ত মেনে নেন্ এবং বর্ণনাতীত মানসিক কষ্ট সত্ত্বেও হুদায়বিয়াতেই উমরা শেষ করে তারা মদীনায় চলে আসেন। মদীনায় প্রত্যাবর্তনের মাত্র দুই সপ্তাহ পর খাইবারের ওপর আক্রমণ করেন এবং খাইবার কব্জা করে নেন। অর্থাৎ শত্রুর মধ্যে একটিকে পরাজাতি করে ফেলেন। এই পরাজিত করাটাও ছিল খুবই অস্বাভাবিক। মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র চৌদ্দশ' আর শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা ছিল বিশ হাজার! চৌদ্দশ' বিশ হাজারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং মাত্র দুই-চার দিনের মধ্যে পুরো এলাকা কব্জায় নিয়ে এসেছে এবং এদিককার আশংকাটি চিরতরে সমাধিস্থ্ করে দিয়েছেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে এ কথারও উল্লেখ ছিল, যে কোন সম্প্রদায় চাইলে এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। এরই ভিত্তিতে মক্কার পূর্ববন্ধু কবীলা আহাবিশ এসে বলল, আমরা উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে মক্কাবাসীর পক্ষে এই চুক্তিতে শরীক হচ্ছি। পক্ষান্তরে কবীলায়ে খুযাআর' লোকেরা বলল, আমরাও একই ভিত্তিতে মুসলমানদের পক্ষে এই সন্ধির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। অবশ্য এই দুই কবীলার মধ্যে পরস্পর লড়াই ছিল। শুরুতে কোন সমস্যাও হয়নি।

কিছুদিন পর হঠাৎ করে একটি ঘটনা ঘটে গেল। বনূ কিনানায় একটি ক্ষুদ্র কথা নিয়ে ঝগড়া বেধে গেল। তখন বনূ কিনানার এক লোক রাসূল (সা.) গালি দিয়ে বসে। কবীলায়ে খুযাআর লোকেরা এটা বরদাশ্ত করতে পারেনি। তাই তারা লোকটিকে হত্যা করে ফেলে। জবাবে তারাও এদের উপর আক্রমণ করে এবং এদেরও দু'চারজন মারা যায়। বিষয়টি অতঃপর একটি আঞ্চলিক দুর্ঘটনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। কিন্তু কিছু দিন পর যখন মক্কার লোকেরা বিষয়টি

জানতে পারে, তাদের সন্ধিবন্ধু কবীলার ওপর মুসলমানদের বন্ধু কবীলার লোকেরা আক্রমণ করেছে এবং একজন মানুষকে হত্যা পর্যন্ত করে ফেলেছে, তখন তারা পোশাক পরিবর্তন করে নেকাব পড়ে এসে কবীলায়ে খুযাআর ওপর হামলা করে এবং লুটপাট করে। আক্রান্ত হবার এই কাহিনী খুযাআর লোকেরা মদীনায় পৌঁছে দেয়। কিন্তু এই ঘটনার বর্ণনায় তারা একটি খুবই চমৎকার বাক্য ব্যবহার করে। বাক্যটি ছিল– "আমরা যখন রুকু এবং সিজদায় ছিলাম তখনই এরা আমাদের ওপর এসে আক্রমণ করে।" এতে বুঝা যায়, এদের মধ্যে অনেক লোক মুসলমান ছিল। তাই মুসলমানদের ওপর যে বন্ধন ছিল, সেই চুক্তিবন্ধন খুলে গেল। এখন তারা মক্কার ওপর হামলা করতে পারে। কিন্তু তখন রাসূল (সা.) যুদ্ধে জড়াতে চাচ্ছিলেন না। খুযাআর প্রতিনিধি দলকে তিনি তখন ইরশাদ করলেন ঃ 'এই যে মেঘমালা উড়ে যেতে দেখছো, তার বিকট শব্দগুলো তোমাদের বিজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছে।' অর্থাৎ তিনি তাদেরকে শান্ত করে দেন এবং বলে দেন, বিজয় তোমাদেরই হবে। তবে কীভাবে সেটা বলেননি। তারা শান্ত মনে ফিরে যায়। অবশ্য তারা অনুমান করে নেয়, হযরত খুব শীঘ্রই মক্কার ওপর হামলা করবেন।

মদীনার চারপাশে এমন কিছু স্থান ছিল যেগুলোকে শহরের ফটক বলা চলে। রাসূল (সা.) এসব স্থানে প্রতিরক্ষা প্রহরা বসালেন। উদ্দেশ্য, যাতে বাইরের লোক মদীনায় প্রবেশ করতে না পারে এবং ভেতরের কেউও যেন বাইরে যেতে না পারে। কারণ, এতে মদীনার প্রস্তুতি সংবাদ বাইরে ছড়িয়ে পড়ার আশংকা ছিল। এদিকে মদীনার মুসলমানদের বলে দিলেন, আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজে বের হব। তোমরা প্রস্তুত হও! কিন্তু কোথায় যাবেন, কখন যাবেন একথা কাউকেই বলেননি। এবং এই গোপনীয়তা এত কঠিন ছিল, একদিন হযরত আবু বকর (রা.) রাসূল (সা.)-এর ঘরে গিয়ে দেখলেন তিনি ঘরে নেই। তখন তদীয় তনয়া উম্মুল মুমিনীন হযরত আইশা (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ মা, খুব বড় যুদ্ধ হবে বলে মনে হয়! তা হযরত যাবেন কোথায়? হযরত আইশা বলেন ঃ আব্বাজান, আমার তো জানা নেই। হয়তো সিরিয়ার দিকে যাবেন অথবা অন্য কোথাও! এই মুহূর্তে হযরত (সা.) এসে উপস্থিত। তিনি তাদের কথার ধরন শোনেই বিষয়টি আঁচ করে ফেলেন। যেহেতু হযরত আবু বকর (রা.)কে পরিপূর্ণভাবেই বিশ্বাস করতেন, তাই বললেন ঃ যাব মক্কায়! তবে কাউকে বলা যাবে না!

এখানে হযরত (সা.) আরেকটি কাজ করেন, যেটা সম্পর্কে যুদ্ধ বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারবেন এটা কত নিখুঁত এবং গভীর চিন্তাসমৃদ্ধ কৌশল ছিল! তখন মুসলমানদের অনেক বন্ধুগোত্র ছিল। যারা যে কোন যুদ্ধের সময় সেচ্ছাসেবক

ফৌজ পাঠিয়ে মুসলমানদের যুদ্ধে সহযোগিতা করত। নিয়ম ছিল, প্রত্যেক গোত্র তাদের ফৌজকে পাঠিয়ে দিত। অতঃপর মদীনা থেকে মদীনার ফৌজ এবং বহিরাগত ফৌজ একত্রে যুদ্ধে রওনা হতো। কিন্তু এ যাত্রায় হযরত (সা.) ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি প্রত্যেক গোত্রের সরদারকে ডেকে পাঠালেন এবং প্রত্যেক গোত্রপতির সাথে সম্পূর্ণ আলাদা বৈঠক করে একথা জানালেন ঃ আমরা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে যাব। সে জন্য তোমরা তোমাদের এলাকায় এমনভাবে তৈরি থাকবে, যেন ঘোষণা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে আসতে পার। আর তোমাদের মদীনায় আসতে হবে না। আমরা যাবার সময়ই তোমাদের ডেকে নিয়ে যাব। এভাবে একই পরামর্শ দিয়ে সকল গোত্রপতিকে বিদায় করে দেন। কিন্তু যাবেন কোথায় সেটা অনবহিতই থেকে যায়!

সর্বত্র সাজ সাজ রব কিন্তু যাবে কোথায় তা কেউ জানে না। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হুযাইফা তুবনুল- ইয়ামান (রা.)'র বর্ণনা বুখারী শরীফে বিধৃত হয়েছে এই ভাবে- মদীনা থেকে মক্কা দক্ষিণে। হযরত (সা.) যখন বের হোন তখন তিনি উত্তরে রওনা হোন। অনুমান করা হচ্ছিল, তিনি হয়তো বিজানতিনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাচ্ছেন। দেখা গেল, সেখানকার লোকদেরকে নিয়ে তিনি উত্তর-পশ্চিম দিকের পথ ধরেছেন। অতঃপর পথ বদলে বদলে চলতে থাকেন। মক্কার পবর্তমালার কোলে না আসা পর্যন্ত আমরা বুঝতেই পারিনি কোথায় যাচ্ছি!

এযাত্রায় মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল দশ হাজার। সেকালের হিসাবে এটা একটা বিরাট বাহিনী। এতবড় বাহিনী তো লুকিয়ে রাখা যায় না। অথচ এরপরও বিষয়টি মক্কাবাসীর অজ্ঞাতে থেকে যায়।

মুসলমানদের একটি রীতি ছিল, সফরে চার-পাঁচজন একত্রে খাবার তৈরি করে খেত। কিন্তু এবার রাসূল (সা.) আদেশ দিলেন, প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা আগুন জেলে নিজ নিজ খাবার রান্না করে খাবে। এর ফলে দশ হাজার ফৌজের রান্নার জন্যে দশ হাজার চুলা জ্বলে ওঠে। মক্কার নেতা আবু সুফয়ানের তো আশংকাই ছিল, যে কোন সময় মুসলমানরা হামলা করতে পারে। সেতো অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে তাই মনে পুলিশ পুলিশ ভাব। তাই প্রতি রাতেই মক্কার টিলাগুলোতে ওঠে চোখ ফেরায়, যাতে শত্রুর আগমনটা দূর থেকেই টের পেতে পারে।

আজ পাহাড়ে ওঠে যখন দশ হাজার চুলো জ্বলতে দেখে তখন তো তার চোখ কপালে। দশ হাজার চুলো! তাহলে তো পঞ্চাশ হাজার সৈন্য হবে। সে পা টিপে টিপে ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হয়। আকস্মিক কাউকে পেয়ে গেলে অন্তত কারা এসেছে তা তো জানা যাবে!

মুসলিম ফৌজের একটি নিয়ম ছিল, কোথাও তাবু করার পর কিছু সেপাই টহল দিয়ে ফিরতো, যাতে আকস্মিকভাবে কোন শত্রু এসে চোরাগুপ্তা হামলা করতে না পারে। এই জাতীয় টহল বাহিনীর হাতে আবু সুফয়ান ধরা পড়ে যায়। মক্কার নেতাকে ধরে এনে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে হাজির করে। রাসূল (সা.) তার সাথে ভালো আচরণের আদেশ দেন। তবে যাতে চলে যেতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে বলেন।

বিস্ময়কর বিজয়

সকাল বেলা হযরত (সা.) ফৌজ শহরে প্রবেশের আদেশ দেন। তাঁর ধারণা ছিল মক্কার লোকেরা তো তাঁদের আগমনবার্তা জানেই না। তাছাড়া শহরে তেমন নেতাও নেই। নেতা থাকলে তাৎক্ষণিক একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারতো। এই সাথে রাসূল (সা.) একজন সৈনিককে বলেন ঃ তুমি আবু সুফয়ানকে নিয়ে অমুক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াও! যাতে সে দেখতে পায়, মুসলমানদের ফৌজ কত বড়! তারপর তার সামনে দিয়ে দশ হাজার সৈনেন্য বিরাট বহর চলে যায়। প্রত্যেকটি দল যাবার সময় পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় এটা অমুক গোত্রের ফৌজ। সবশেষে আসে রাসূল (সা.)-এর বাহন। তখন হযরত আব্বাস (রা.) বলেন ঃ দেখ, এটা রাসূলুল্লাহ! তখন আবু সুফয়ান বলে ঃ আব্বাস! তোমার ভাতিজা তো সত্যি সত্যিই বাদশাহ হয়ে গেছে। তার শক্তিকে রুম সম্রাট পর্যন্ত ভয় পেতে শুরু করেছে। যাবার সময় হযরত (সা.) আদেশ দিয়ে যান, আবু সুফয়ানকে ছেড়ে দাও। এই ঘোষণাও তখন একটি অস্বাভাবিক ঘোষণা ছিল। মুক্ত হবার পর আবু সুফয়ান চিন্তা করে এখন যুদ্ধ করা অনর্থক। মুসলমান সৈন্যরা শহরে যথারীতি ঢুকে পড়েছে। তারা নবীজীর নির্দেশে বিভিন্ন গলিপথ প্রদক্ষিণ করছে আর চিৎকার করে ঘোষণা দিচ্ছে, যে ব্যক্তি হাতিয়ার ফেলে দিবে সে নিরাপদ। যে ব্যক্তি ঘরে ঢুরে ঘরের দরোজা বন্ধ করে দিবে সেও নিরাপদ। যে রাস্তায় বের না হবে, যে কাবা শরীফের চত্বরে কিংবা আবু সুফ্য়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে সেও নিরাপদ। এই ঘোষণা শুনে তাদের কেউ কেউ এই ধারণা করাও বিচিত্র ছিল না, আবু সুফয়ান হয়তো মুসলমান হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে আবু সুফয়ান এসে দশ হাজার সৈন্যের আগমন আর কুরাইশদের অক্ষমতার কথা বললে তার স্ত্রী তার দাড়ি ধরে সজোরে চপেটাঘাত করে বলে, এ তোমার কাপুরুষতা বৈ কিছুই নয়।

শহরে প্রবেশের পর রাসূল (সা.) একজন ঘোষক পাঠান। সে ঢোল পিটিয়ে শহর জুড়ে ঘোষণা দেয়, মক্কাবাসীরা! তোমরা কাবা শরীফের চত্বরে এসে সমবেত হও! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের সাথে কিছু কথা বলবেন !!

তাদের অন্তর তখন কাঁপছে ভয়ে, অজানা আশংকায়! না জানি কি হয়! তখন খুব সম্ভব জোহর নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল। রাসূল (সা.) হযরত বেলালকে আযান দিতে বলেন। সেদিন হযরত বেলাল (রা.) কাবা শরীফের ছাদে ওঠে আযান দিতে শুরু করেন এবং সুরের লহরী তুলে সুউচ্চ স্বরে ঘোষণা করেন– আশহাদু আন্না মুহামম্মাদার রাসূলুল্লাহ----। উপস্থিত লোকদের মধ্যে বেশ কিছু মুশরিকও ছিল। তাদের মধ্যে কট্টর ইসলাম দুশমন ইতাব ইবনে উসাইদও ছিল। সে এই অবিনাশী কণ্ঠ শুনে তার পাশে দাঁড়ানো মুশরিক বন্ধুকে ফিসফিসিয়ে বলে ঃ ভাগ্যিস আমার বাবা মরে গেছে। নইলে কাবা ঘরের ছাদে উঠে এক কালো কুশ্রী মানুষের মুখে এই বীভৎস চিৎকার সহ্য করতে পারতো না। আযানের পরে নামায হয়। নামাযের পর রাসূল (সা.) কুরাইশদের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ান। এবং বলেন, তোমরা আমার কাছে কি প্রত্যাশা করছো? বিগত বিশ বছরের কৃত অত্যাচার ফ্যাসাদ সৃষ্টির যাবতীয় ভয়ানক চিত্রগুলো স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে তাদের। তারা সকলেই মাথা নুইয়ে দেয়। শত লজ্জা ও অপমানের ভারে নমিত অস্পষ্ট কণ্ঠে আরয করে, আপনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আপনার পিতাও ছিলেন ভাল মানুষ। অতঃপর রাসূল (সা.) তাদেরকে লক্ষ্য করে ইতিহাসের অপূর্ব অশ্রুত সেই ঘোষণাই দেন–

তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই;

সকলেই তোমরা মুক্ত ॥

এখানে একথা বলা প্রয়োজন, হযরত (সা.)-এর দখলে তখন পুরো নগরী! সঙ্গে বিশাল যোদ্ধা বাহিনী। তিনি ইচ্ছা করলেই সাধারণ হত্যার ঘোষণা দিতে পারতেন। তারা এর উপযুক্ত ছিল এবং এটা করার যথার্থ শক্তিও হযরতের ছিল। তাছাড়া তাদের সকলকে গোলাম বানাবার আদেশও করতে পারতেন। লুটপাটের নির্দেশ দেয়াও খুব সহজ ছিল। কিন্তু তিনি তার কোনটাই করেন নি; বরং সরল ছন্দগদ্যে ঘোষণা করেছেন ঃ 'তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই। তোমরা সকলেই মুক্ত।' তাঁর একথা যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল তখন। ইতাব ইবনে উসাইদ যে একটু আগে হযরত বেলালের আযান শুনে বলেছিল, আজ যদি আমার পিতা বেঁচে থাকত তাহলে কাবার পিঠে চরে এই কালো গাধাটার কণ্ঠে ভেঁ ভেঁ শব্দটা সহ্য করতে পারতেন না। অথচ সেই প্রিয় নবীজীর সামনে এসে বিনীত কণ্ঠে আরয করছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি উসাইদ পুত্র ইতাব! 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মানুদ নেই, এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর রাসূল।' ইতাবের ইসলাম গ্রহণের ধ্বনি নবীজীর কর্ণকূহরে পৌছতেই তিনি ঘোষণা দেন; ইতাব! তোমাকে আমি মক্কার গভর্নর বানাচ্ছি।

কী আশ্চর্য! সদ্যবিজিত নগরী! এখানে কোন নিজস্ব লোককে গভর্নর বানিয়ে

একজন নবদীক্ষিত মুসলমানকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী গভর্নর বানিয়ে মদীনায় চলে আসেন। শুধু একজনই যে মুসলমান হয়েছে তাই নয়। রাতারাতি মক্কার চিত্র বদলে গেছে। সকলেই উঠে এসেছে ইসলামের সামিয়ানার তলে। মুহূর্তে জেগে উঠেছে মৃত বিশ্বাস শত বছরের কঠিন শক্তিতে। দু'বছর পর যখন ধর্মত্যাগের ঝড় ওঠে কোন কোন কবীলায় তখন এই মক্কাবাসীরা কঠিন ঈমানদারদের কাতারে।

এই সম্পর্কে ছোট্ট একটি ঘটনা বলেই 'মক্কা বিজয়' এর ঘটনার সমাপ্তি টানছি। মক্কা বিজয়ের পর আবু সুফয়ানের স্ত্রী ঈমান আনার পালা। তার নাম ছিল হিন্দা। তার পুত্র, ভাই ও চাচা সকলেই বদর যুদ্ধে মারা গিয়েছিল। যার প্রতিশোধের নেশা মিটাতে গিয়ে সে ওহুদযুদ্ধে শহীদ হযরত হামযা (রা.)-এর বুক চিরে তার কলিজা চিবিয়েছিল। যখন মুসলমানগণ মক্কা দখল করে নিলেন তখন তার ঘরে এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। সে একটি শক্ত লাঠি নিয়ে ঘরে সংরক্ষিত এক একটি মূর্তিকে ভেঙ্গে খান খান করতে থাকে আর চিৎকার করে বলতে থাকে, এতদিন তোরাই আমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিলি। এখন বুঝতে পারলাম, আসলে তোদের কোন শক্তি নেই। সে মনে মনে দারুণ ভয় পায়। একরকম ভেঙ্গে পড়ে। হযরত হামযা (রা.)'র প্রতি তার কৃত অপরাধবোধ তাকে প্রচণ্ডভাবে তাড়িত করতে থাকে। ভাবে, আমাকে জানি কি শাস্তি দেয়া হয়! তারপর সে ভয়ে ভয়ে চেহরায় নেকাব পরে মেয়েদের দলের সাথে হযরতের দরবারে হাজির হয়ে যথারীতি ইসলাম গ্রহণ করে। তখন রাসূল (সা.) উপস্থিত মহিলাদেরকে বাইআত করান। তাঁর সে বাইআত ও অঙ্গীকার গ্রহণের ভাষাগুলো ছিল এমন– তোমরা অঙ্গীকার কর, একমাত্র আল্লাহকেই মানবে, আর কখনো মূর্তিপূজা করবে না; আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। হিন্দা তখন উচ্চ কণ্ঠে বলল ঃ এত দিন আমরা ধোকায় ছিলাম। আজ টের পেলাম, মূর্তিগুলোর কোন শক্তি সামর্থ নেই। আমরা আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করি। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না। তখন হিন্দা অহংকারের সাথে বলল ঃ কোন সম্ভ্রান্ত নারীর পক্ষে কি এটা সম্ভব? রাসূল (সা.) বললেন ঃ তোমরা তোমাদের শিশু সন্তানদেরকে জীবিত প্রোথিত করে হত্যা করবে না। একথার পর হিন্দা যে কথা বলেছিল তা খুবই চমৎকার। সে বলল ঃ হে রাসূল! আমরা যেসব সন্তানদেরকে লালন-পালন করে বড় করেছি আপনি তো তাদেরকেই হত্যা করে ফেলেছেন! রাসূল (সা.) ঈষৎ হেসে জিজ্ঞেস করেন ঃ এটা কে? উত্তর দেয়া হয়, হিন্দা! কথকতার এখানেই শেষ।

মক্কা বিজয়ের এই ঘটনা মানবেতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায়। তৎকালীন পৃথিবীর এক বিরাট শহর এমনভাবে দখল করে নেয়া হচ্ছে, দখলের চূড়ান্ত মুহূর্ত

পর্যন্ত সকলেই বে-খবর। এবং যাদের অত্যাচারে দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছিল এক বিরাট যোদ্ধা গোষ্ঠী তারাই আজ এই বিজয়ের নেতৃপুরুষ। অথচ এই মহান অপারেশনে এক ফোটা রক্তও ঝরেনি।

যুদ্ধ সম্পর্কে সেকালের মুসলমানদের ধারণা

এখানে আরেকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ জরুরী ভাবছি। তাহলো কিভাবে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নেয়া হত এবং যুদ্ধের মাঠে কিভাবে ব্যবস্থা নেয়া হতো। আমরা লক্ষ্য করলে দেখব, প্রতিটি যুদ্ধেই নার্সিং, খাবার রান্না করা, কবর করে লাশ দাফন করা ইত্যাকার প্রাসঙ্গিক কাজে মুসলমানদের ফৌজে নারীরাই অংশ গ্রহণ করেছেন।

একটি স্বতন্ত্র ফৌজ (standing army) যে রাখা প্রয়োজন একথা একেবারে সূচনাকালেই লক্ষ্য করা হয় নি। বরং রাসূল (সা.) ঘোষণা দিয়েছেন, নামায পড়া যেমন ফরয যুদ্ধ করাও তেমনি ফরয। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারা এর উপর বিশ্বাস রাখতো। তাই যখন যুদ্ধ বেধেছে রাজ্যের সমগ্র সামর্থবান মানুষগুলো থেকে যতজন প্রয়োজন নিয়ে নেয়া হয়েছে। এ জন্যে আলাদা ফৌজ তৈরীর প্রয়োজন পড়ে নি। তবে পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক থাকতো তখন নানা রকম প্রশিক্ষণ প্রতিযোগিতা হতো। ঘোড়া দৌড়, উঠের দৌড়, গাধার দৌড় ও নৌকা দৌড় থেকে শুরু করে তীরান্দাজীর পর্যন্ত প্রশিক্ষণ হতো। এবং রীতিমত পুরষ্কার দেয়া হত। সারকথা হল, হযরত (সা.)-এর যুগে সুরক্ষিত আলাদা বাহিনী প্রস্তুত রাখার প্রয়োজন ছিল না। বরং স্বাভাবিক অবস্থাতেই সকল যোদ্ধা মুসলমানগণ জীবন সর্বস্ব উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকতেন। যে কারণে, এক মুঠো সৈন্য সর্বদাই দুই গুণ তিনগুণ চারগুণ সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। একথা ভেবে দেখেননি, আমরা এই অল্প সামান্য লোক এত বিশাল বড় বাহিনীর বিরুদ্ধে কি করে যুদ্ধ করব!?

আমি রহমতের নবী; আমি যুদ্ধের নবী

সর্বশেষ যে কথাটি বলতে চাই তাহলো, লড়াই চলাকালে সিপাহসালারকে বিভিন্ন বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়। যেমন একটি বিষয় আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন কোথাও যুদ্ধে সকাল বেলা আক্রমণ করতেন তখন লক্ষ্য রাখতেন, সূর্যটা যেন পেছনে থাকে তাহলে সূর্যের আলোক রশ্মিটা শত্রুর চোখে মুখে পড়বে। এতে তারা যুদ্ধ পরিচালনায় কঠিন বিভ্রান্তির মুখোমুখি হবে।

যুদ্ধের সময় হযরত (সা.) আবহওয়ার প্রতিও লক্ষ্য রাখতেন। বাতাস যাতে পেছন থেকে বয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন। কারণ, বাতাসমুখি চলতে গেলে এমনিই অনেক শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়। হযরত (সা.) নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন—

اَنَا نَبِىُّ الرَّحْمَةِ اَنَا نَبِىُّ الْمَلْحَمَةِ

'আমি রহমতের নবী, আমি যুদ্ধের নবী।'

হযরত (সা.)-এর জীবনী গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে একথাই ফুটে ওঠে, এক রহমতপূর্ণ দূরদর্শী কুশলী সিপাহসালার ছিলেন তিনি। অর্নিবচনীয় দৃঢ়তা ও বিচক্ষনতার সাথে লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যেতেন। মানুষের রক্ত প্রবাহিত করতে কিংবা দুশমনকে নিঃশেষ করতে তার কোন আগ্রহ কখনেই পরিলক্ষিত হয় নি॥

দাওয়াত ও জিহাদ

মাওলানা মনযূর নু'মানী (রহ.)

শামেলী ও রেশমী রুমাল আন্দোলনের বিশ্বস্ত উত্তরসুরী॥

প্রথমেই আমরা এখানে পবিত্র কুরআন থেকে এমন কিছু আয়াত পত্রস্থ করব, যাতে দীনে ইসলামের খেদমদ, সাহায্য, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম ও সাধনা চালিয়ে যাবার প্রতি সাধারণভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে, গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। চাই সেটা যেভাবেই হোক, যে আঙ্গিকেই হোক। অতঃপর আমরা আল-কুরআনের এমন কিছু আয়াত তুলে ধরব, যাতে ইসলামের বিশেষ বিশেষ খেদমতের প্রতি সবিশেষ তাকীদ ও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। প্রথম প্রকার সম্পর্কিত আয়াতগুলো শুনুন তাহলে। আল্লাহ তাআলা সূরা মাইদা'য় ইরশাদ করেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ [مائدة/ع ٦]

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এবং তার (নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের) পথ অন্বেষণ কর; (অর্থাৎ এমন কাজে নিবিষ্ট হও যাতে তিনি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। এবং এই সন্তুষ্টি লাভের একটি বিশেষ আমল হলো–) তোমরা তাঁর দীনের পথে সংগ্রাম কর– যাতে তোমরা সফল হতে পার, বিজয় লাভ করতে পার।

সূরায়ে হজের শেষান্তে ইরশাদ করেছেন–

وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ

حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ
(سورة الحج ، ع/٧٨)

'তোমরা আল্লাহ'র পথে সংগ্রাম কর যথাযথ ভাবে। (হে উম্মতে মুহাম্মাদী!) তিনিই তোমাদেরকে এই খেদমতের জন্য নির্বাচন করেছেন। তোমাদের জন্য এই দীনে তিনি কোন সংকট রাখেননি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের পথ। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন (এই গ্রন্থে) এবং এর পূর্বর্তী গ্রন্থ সমূহে– যেন রাসূল (সা.) তোমাদের অভিভাবক ও শিক্ষক হোন আর তোমরা যেন অভিভাবক ও শিক্ষক হও সমগ্র মানব মন্ডলীর।' (হজ্ব - ৭৮)

সূরায়ে সাফ-এ ইরশাদ করেছেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ - تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ * وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ - (سورة الصف ع/١٠)

'হে ঈমাদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দেব– যা তোমাদেরকে দুবির্ষহ আযাব থেকে মুক্তি দেবে? (তাহলে শোন, সেই ব্যাবসাটি হলো–) তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে; তোমাদের জান-মালসহ আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে– ওটাই তোমাদের জন্য উত্তম– যদি তোমার বুঝতে। (যদি তোমরা তা কর–) তাহলে আল্লাহ তোমাদের গোনাহ্ মাফ করে দেবেন এবং এমন জান্নাতে স্থান দিবেন যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত, তোমাদের নিবাস দেবেন সদা আমোদিত বাগিচার উত্তম মহলে। এটাতো বিশাল সফলতা। (পরকালীন এই মহান সফলতা ছাড়াও রয়েছে-) আরেক পুরস্কার, যা তোমরা খুবই পছন্দ কর। (তাহলো) শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহ'র সাহায্য এবং অত্যাসন্ন বিজয়। (হে রাসূল!) আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ'র সাহায্যকারী হয়ে যাও–

যেমনটি হযরত ঈসা (আ.) তদীয় সহচরগণকে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ'র পথে আমাকে কে সাহায্য করবে? তখন সহচরগণ বললেন ঃ আমরাই আল্লাহ'র সাহায্যকার– তাঁর পথে সাহায্যকারী।'

সূরায়ে 'সফ'-এর শেষে এই উম্মতের ঈমানদারগণকে এই বলে আহ্বান করা হয়েছে, তোমরা আল্লাহ'র সাহায্যকারী হয়ে যাও! কত আন্তরিক আহ্বান; কত মর্মস্পর্শী পয়গাম।' সেই সাথে বলা হয়েছে, হযরত ঈসা (আ.) যখন তাঁর সহচরগণকে বলেছিলেন, আল্লাহ'র পথে কে আমাকে সাহায্য করবে? উত্তরে তাঁরা বলেছিলেন ঃ আমরাই আল্লাহ'র সাহায্যকারী। এতে প্রতিভাত হয়ে ওঠে, এই আয়াতগুলোতে যে জিহাদ ও দীনের সাহায্য করার প্রতি আহ্বনা করা হয়েছে তার অর্থ শুধু যুদ্ধই নয়; বরং দীনের জন্য সার্বিক সহায়তা, দীন প্রতিষ্ঠার সার্বিক প্রচেষ্টাই এর উদ্দেশ্য। কারণ, হযরত ঈসা এবং তাঁর সহচরগণ সম্পর্কে এটা সুবিদিত সত্য যে, তাঁরা কখনো যুদ্ধ করেননি; বরং দাওয়াত, তাবলীগ, তা'লীম, তাযকিয়া-আত্মশুদ্ধি ও সমাজ সংস্কারের মহানব্রত পালনে সমূহ কষ্ট করেছেন, শত নির্যাতন সয়েছেন।

সারকথা হলো, বক্ষমাণ আয়াতগুলোতে ঈমানদারগণকে 'জিহাদ' কিংবা 'নুসরাত' শব্দের মাধ্যমে দীনের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা, সংগ্রাম ও দাওয়াতের প্রতিই আহ্বনা করা হয়েছে। সুতরাং দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিবেদিত সকল চেষ্টা, মেহ্নত, কুরবানীই এর অন্তর্ভুক্ত। চাই সেটা দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে হোক; শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হোক; কিংবা হোক জঙ্গ-যুদ্ধের মাধ্যমে।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দীনের জন্য
সংগ্রাম খেদমত ও সাহায্য করার গুরুত্ব

এখন আমরা এমন কিছু আয়াত পত্রস্থ করব, যাতে দীনী প্রচেষ্টা, সংগ্রাম সাধনা এবং দীনী খেদতের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কথা উল্লিখিত হয়েছে। সেই সাথে মুসলিম মিল্লাত তথা ঈমানদারগণকে আহ্বান করা হয়েছে, উৎসাহিত করা হয়েছে দীনী সংগ্রাম ও সাধনার বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে বিশেষ কোন পথে, বিশেষ কোন কর্মের প্রতি। যেমন–

১. সত্যের ডাক, সৎ কাজের আদেশ
ও অন্যায় কাজে বাধাদান

এ মর্মে সূরা আলে–ইমরানে ইরশাদ হয়েছে—

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ (آل عمران - ع/١٠٤)

'তোমাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় থাকা অতি জরুরী– যারা মানুষকে কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দিবে, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে –এবং তাঁরাই হলো প্রকৃত সফলকাম।' বক্ষমান আয়াতে উল্লিখিত 'মিন্‌কুম' শব্দটির কারণে কেউ সংশয় পোষণ করতে পারনে হয়তো, সত্যের প্রতি আহ্বান, সৎ কাজের আদেশ আর অন্যায় কাজের বাধা দান– এটা সমগ্র উন্মতের দায়িত্ব নয়। অথচ এই ধরনের ধারণা ঠিক নয়। ঠিক নয় প্রথমত এই কারণে, এই আয়াতেরই শেষাংশে বলা হয়েছে 'তাঁরাই হলো প্রকৃত সফলকাম।' সুতরাং যে কাজের মধ্যে মুক্তি ও সফলতা নিহিত সেটা কোন বিশেষ শ্রেণীর কাজ হতে পারে না। তাছাড়া অত্র আয়াতের চার-পাঁচ আয়াত পরেই ইরশাদ হয়েছে—

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ـ (ال عمران ـ ع/١٢)

'(হে উম্মতে মুহাম্মদী!) তোমারাই হলে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, যাদের সৃষ্টিই হয়েছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ করবে, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে আর বিশ্বাস রাখবে আল্লাহ'র প্রতি।'

এই আয়াতে বর্তমান উম্মাহ'র সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই বলা হয়েছে, তারা আল্লাহ'র প্রতি ঈমান আনবে, সৎ কাজের আদেশ করবে, অন্যায় কাজে বাধা দেবে, মানব জাতির ইসলাহ্ ও সংশোধনের লক্ষ্যে কাজ করে যাবে। সুতরাং এসব আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, এগুলো সমগ্র উম্মতের কাজ। এ দায়িত্ব সকলের। তবে হ্যাঁ, অধিকাংশ সময় হয়তো এ দায়িত্বে সকলকেই জড়িয়ে থাকতে হয় না; বরং এসব কাজে যোগ্য প্রয়োজন পরিমাণ লোকজন যদি এসব দায়িত্বে সক্রিয় থাকেন আর অবশিষ্ট সকলে যদি তাঁদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে যান তাহলেই সকলের কর্তব্য আদায় হয়ে যায়। সুতরাং এই অধম (লেখক)-এর ধারনা হলো, এ কারণেই আয়াতে 'মিনকুম' শব্দটি যুক্ত হয়েছে। 'আল্লাহই ভালো জানেন।' এ সম্পর্কে সূরায়ে নিসায় আরও ইরশাদ হয়েছে–

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاؤدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ـ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ـ (مائده ـ ع/ ৭৯)

'বনী ইসরাইলের যারা কুফুরী করেছে তাদের প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে হযরত ঈসা ও হযরত দাউদ (আঃ)-এর যবানে। কারণ, তারা অন্যায় করেছে, অবাধ্য হয়েছে এবং তারা সীমা লংঘন করতো। (এবং অভিশপ্ত হবার একটি বিশেষ কারণ হলো,) তারা যে অন্যায় করতো তাতে তারা পরস্পরে একে অপরকে বাধা দিত না। নিশ্চয় এটা তাদের চরম অন্যায় কাজ ছিল।'

এই আয়াত দ্বারা আলোকিত হয়ে ওঠে, সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের বাধা দান এমন একটি অনস্বীকার্য কর্তব্য, যে বিষয়ে গাফলতি, আলস্য ও অনীহা দেখানোর কারণে নেই বনী ইসরাইল লা'নত ও অভিশাপের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। এবং এও পরিষ্কার, এ বিষটি পূণরায় আল-কুরআনে আলোচনা করার লক্ষ্যই হলো, এই উম্মতকে সতর্ক করে দেয়া। তাদেরকে এই মর্মে জাগিয়ে তোলা, তোমরাও যদি এই কাজ ছেড়ে দাও, আলসেমি কর তাহলে তোমাদেরকেও বনী ইসরাইলের ভাগ্য বরণ করতে হবে। অভিশপ্ত হতে হবে।

এ সুবাদে কয়েকটি হাদীসও তুলে ধরছি।–হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন—

وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهٖ ـ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكُنَّ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهٖ ، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ ـ (رواه الترمذى)

'সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমরা সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখতে থাক। অন্যথায় নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি নিজের পক্ষ থেকে এমন কোন আযাব পাঠাবেন- তখন তোমরা (সেই আযাব থেকে মুক্তি লাভের জন্য) তাঁর দরবারে দু'আ করতে থাকবে কিন্তু তা কবুল করা হবে না।'

মূলত এই হাদীসটি সূরা মায়েদার উল্লিখিত আয়াতটিরই ব্যাখ্যা স্বরূপ।

সাহাবী হযরহ আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ ـ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ ـ (رواه مسلم)

'তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন অন্যায় দেখবে তাহলে (যদি সামর্থ্য থাকে) স্বহস্তে-শক্তি দিয়ে অন্যায়কে কল্যাণে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করবে। যদি তা না পারে তাহলে মুখের দ্বারা কথার দ্বারা রূপান্তরের চেষ্টা করবে। যদি তারও সামর্থ্য না থাকে তাহলে অন্তরের দ্বারা চেষ্টা করবে। (অর্থাৎ, মনে মনে ওটাকে মন্দ জানবে এবং তা কীভাবে কল্যাণে রূপান্তরিত করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে।) এটা ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।'

সাহাবী হযরত জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِىْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِىْ - يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُغَيِّرُوْا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُوْنَ اِلَّا اَصَابَهُمْ بِعِقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَمُوْتُوْا (رواه ابودا ود وابن ماجه)

'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ে অবস্থান করত আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করতে থাকে আর সম্প্রদায়ের লোকেরা তার সেই অন্যায়গুলোকে কল্যাণে রূপান্তরিত করার (অর্থাৎ অন্যায় কাজে বাধা দেয়ার) পূর্ণ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি তা না করে তাহলে আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর পূর্বেই তাদেরকে আযাবে নিপতিত করবেন।'

তাবলীগ, তা'লীম, প্রশিক্ষণ- ইসলাহ্ ও সংশোধন

অতঃপর দাওয়াত, তাবলীগ, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ এবং ইসলাহ্ ও সংশোধন সম্পর্কে কিছু আয়াত ও হাদীস তুল ধরছি। সূরা হা-মীম-সিজদায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (حم سجدة ، ع/٣٣)

'তার কথার চাইতে উত্তম কথা আর কার হতে পারে–যে আল্লাহ'র দিকে ডাকে আর নেক আমল করে এবং বলে ঃ নিশ্চয় আমি একজন মুসলমান'।

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার দরবারে তার কথাই সর্বাধিক প্রিয় যে নিজে ঈমান ও উত্তম আমলে সুশোভিত হওয়ার পর অন্যদেরও সেদিকে ডাকে এবং তাদেরকে শুদ্ধ ও সংশোধন করবার চেষ্টা করে। সূরায়ে আসর–এ ইরশাদ হয়েছে—

وَالْعَصْرِ * اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ * اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ *

'যুগের কসম! সমগ্র মানব ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত! তবে তারা (ধ্বংসের মধ্যে নয়; বরং সফলকাম) যারা ঈমান এনেছে, সৎ কর্ম করেছে এবং যারা পরস্পরে সত্য পথে চলার রিপু ও প্রবৃত্তির কামনা থেকে বিরত থাকার ওসিয়ত করে, উপদেশ দেয়।'

'সত্যপথে চলার' এবং 'রিপুর কামনা থেকে বিরত থাকার' ওসিয়ত এবং উপদেশ এমন দু'টি সারগর্ভ বাণী, যাতে তাবলীগ, দাওয়াত, শিক্ষা প্রশিক্ষন, ইসলাহ ও সংশোধন সবই আছে!

এবার কিছু হাদীস শুনুন! সাহাবী হযরত সাহ্ল ইবন সা'দ (রা.) বর্ণনা

করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন—

وَاللّٰهِ لَانْ يَهْدِىَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرٌلَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ ـ رواه ابود اود

'খোদার কসম! তোমার উসিলায় কোন একজন মানুষকে যদি আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দান করেন তাহলে এটা তোমার জন্য (অত্যন্ত দামি ধরনের) লাল উষ্ট্রীসমূহের চেইতে উত্তম।'

সাহাবী হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِ فَا عِلِهٖ ـ رواه مسلم

'যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে কল্যাণের পথ দেখাবে সে ওই কল্যাণকারীর সমান প্রতিদান লাভ করবে।' সাহাবী হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

هَلْ تَدْ رُوْنَ مَنْ اَجْوَدُ جُوْدًا ؟ قَالُوْا ـ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ ـ قَالَ اَللّٰهُ اَجْوَدُ جُوْدًا ثُمَّ اَنَا اَجْوَدُ نَبِىِّ اٰدَمَ وَاَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِىْ رَجُلٌ عَلَّمَ عِلْمًا فَنَشَرَهٗ ـ يَأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمِيْرًا وَحْدَهٗ وَاُمَّةٍ وَاحِدَةٍ ـ رواه التبير فى شعب الايمان ـ

'তোমরা কি জানো, সবচে বড় দাতা কে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন! রাসূল (সা.) ইরশাদ করলেন ঃ সবচে' বড় দাতা আল্লাহ! তারপর আমি হলাম আদম সন্তানদের মধ্যে সবচে' বড় দাতা। অতঃপর সেই ব্যক্তি যে দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষা করেছে এবং তা মানুষের মধ্যে প্রচার ও প্রসার করতে সচেষ্ট হয়েছে! এমন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সরদার ও নেতা হিসেবে উত্থিত হবে।'

হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আবযা (রা.) বর্ণনা করেন ঃ

خَطَبَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ـ فَاَثْنٰى عَلٰى طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا ـ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ لَايُفَقِّهُوْنَ جِيْرَانَهُمْ وَلَا يُعَلِّمُوْنَهُمْ وَلَا يَعِظُوْنَهُمْ وَلَا يَاْمُرُوْنَهُمْ وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ ـ وَمَا بَالُ اَقْوَامٍ ـ لَايَتَعَلَّمُوْنَ مِنْ جِيْرَانِهِمْ وَلَا يَتَفَقَّهُوْنَ وَلَا يَتَّعِظُوْنَ ـ وَ اللّٰهِ لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ جِيْرَانَهُمْ وَيُفَقِّهُوْنَهُمْ وَيَاْمُرُوْنَهُمْ

وَيَنْهَوْنَهُمْ وَلَيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ وَيَتَفَقَّهُوْنَ وَيَتَّعِظُوْنَ أَوْ لَأُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوْبَةُ ـ (رواه الطبرانى فى الكبيراجمع الفوائد)

'একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) বক্তৃতা দিলেন! এতে মুসলমানদের কোন সম্প্রদায়ের প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন! আচ্ছা, অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের কি হলো, তারা তাদের প্রতিবেশীদের দীনী উপলব্ধি সৃষ্টিতে সচেষ্ট হয় না; তাদেরকে দীনী শিক্ষা দেয় না; তাদেরকে উপদেশ দেয় না; সৎকাজের আদেশ করে না এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখে না! আর ওসব সম্প্রদায়েরই বা কী হলো, তারা তাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে দীনী চিন্তা ও উপলব্ধি অর্জন করে না, দীনী শিক্ষা গ্রহণ করে না, উপদেশ নেয় না! আল্লাহর কসম! (দীনী বিষয়ে জ্ঞাত ও শিক্ষিত) সকল সম্প্রদায়েরই কর্তব্য হলো, স্বীয় প্রতিবেশীদের শিক্ষাদানে সচেষ্ট হওয়া, তাদের মধ্যে ধর্মীয় উপলব্ধি ও চেতনা প্রতিষ্ঠা, তাদেরকে উপদেশ দান, সৎ কর্মের আদেশ ও অন্যায় থেকে বিরত রাখতে সক্রিয় থাকা! আর যাদের মধ্যে ধর্মীয় কোন জ্ঞান ও শিক্ষা নেই তাদের কর্তব্য হলো, তাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করা। দীনী জ্ঞান ও চিন্তা অর্জন করা; তাদের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করা! (সার কথা হলো, যারা ধর্মীয় দায়িত্ব, কতর্ব্য ও জীবন বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত-শিক্ষিত তাদের কর্তব্য হলো অজ্ঞজনদের জ্ঞাত করে তোলা আর যারা জানে না তাদের কর্তব্য হলো শিক্ষিতজনদের কাছ থেকে জেনে নেয়া, তাই) কোন সম্প্রদায় যদি তাদের কর্তব্য পালনে গাফলতি ও অবহেলা করে তাহলে শিগগিরই আমি তাদেরকে শাস্তি দেব।"

এই হাদীসের আলোকে একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, দীনী দাওয়াত, দীন সম্পর্কে যারা জানে না তাদেরকে দীনী শিক্ষা ও চেতনায় সমৃদ্ধ করে তোলা, তাদেরকে শুদ্ধ ও সংশোধন করা উম্মতের অনিবার্য কর্তব্য। তারা যদি তাদের সে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে; কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে আল্লাহ তাআলার দরবারে তারা অনেক বড় অপরাধী বলে বিবেচিত হবে।

উম্মতের এই ব্যাপক ও অনিবার্য দায়িত্বের কথাই হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর একটি সংক্ষিপ্ত ও প্রসিদ্ধ বাক্যে এইভাবে বিধৃত হয়েছে–

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخارى، مشكوة، كتاب الا مارة)

এর অর্থ হলো, তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অঙ্গন ও অধীনস্থদের অভিভাবক ও দায়িত্ববান। তাই প্রত্যেককেই তার নিজস্ব অঙ্গনের লোকদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।'

এসব আয়াত ও হাদীসের আলোকে নিশ্চয় একথা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে– দীনের প্রতি সাহায্য, দীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, দীনী দাওয়াত, মানুষকে সৎ কর্মের আদেশ দান, অন্যায় ও পাপাচার থেকে বিরত রাখা, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, ইসলাহ ও সংশোধনের সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এই উম্মতের একটি অনস্বীকার্য মহান দায়িত্ব! এ সম্পর্কে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (সা.) কত কঠিন তাকীদ ও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন! তাই এই মহান দায়িত্ব পালনে যারা সচেষ্ট, সক্রিয় তাদের মর্যাদা যেমন অতি উঁচু ঠিক এই দায়িত্বে অবহেলাকারীরাও ভীষণভাবে অভিশপ্ত এবং ঘৃণিত!

আল্লাহর পথে লড়াই

আমি ইতিপূর্বে আলোকপাত করেছি, দীনের খেদমত ও সাহায্যের একটি বিশেষ দিক হলো আল্লাহর পথে লড়াই করা! এ সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীস শোনার পূর্বে যে কথাটি গভীরভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন তাহলো, যুদ্ধ কিংবা লড়াই প্রকৃতপক্ষে কোন ভালো কাজ নয়। কিন্তু কোন ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়লে যেভাবে তার শরীরে ইনজেক্‌শনের সুই ঢোকাতে হয়, চোখের আলো ফিরিয়ে আনার জন্য তাতে অস্ত্রপাচার করতে হয়, শরীরের কোথাও পচন ধরলে যেভাবে সে অংশটা অপারেশন করে কেটে ফেলে দিতে হয় এবং এর কোনটাকেই তখন মন্দ বা জঘণ্য ভাবা হয় না; বরং রোগীর জন্য কল্যাণকামিতাই মনে করা হয়! অনুরূপভাবে যখন কোন বিশাল ফিৎনা-ফাস্যাদ সৃষ্টি হয়, তখন ওই ফ্যাসাদ ও বিপর্যয় থেকে জাতিকে উদ্ধার করার জন্য, কোন অত্যাচারীর অত্যাচার-নির্যাতন থেকে আল্লাহর বান্দাদের মুক্ত করার লক্ষ্যে; আল্লাহ'ও বান্দাদের মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, ঈমানী, আদশির্ক ও ইসলামী দাওয়াতের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এমন জালিম অত্যাচারী শক্তির শিড়দাঁড়া ভেঙ্গে দেবার লক্ষ্যে, যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া, লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া অনেক সময় অনিবার্য হয়ে পড়ে। তখন আর যুদ্ধ ছাড়া বিকল্প কোন পথ থাকে না। এবং তখন যদি পূর্ণ আশা থাকে, শক্তি ও যুদ্ধের দামামা অন্যায় ও অবিচারের কণ্ঠকে রুদ্ধ করতে পারবে; লড়াই করে আনতে পারবে শান্তি ও নিরাপত্তার সন্দেশ তখনই কেবল ইসলাম যুদ্ধের অনুমতি দেয়। তাও শুধুই ইসলামের স্বার্থে, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত শর্তাবলীসহ। বরং তখন যারা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখে, যুদ্ধের অস্ত্র ও বল যাদের আছে, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার যোগ্যতা যাদের আছে, তাদেরকে তখন ইসলাম যুদ্ধ করার আদেশ দেয়।

জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণার কারণ

যুদ্ধ জিহাদ সম্পর্কে অনেকেরই ভুল ধারণা আছে। এর মূল কারণ হলো, জিহাদের মূল মর্ম না বোঝার কারণে তারা মনে করে, 'জিহাদ হলো মুসলমানদের জাতিগত যুদ্ধ।' অথচ ইসলাম এবং কুরআন জাতি ও গোত্র ভিত্তিক সকল যুদ্ধকে পরিষ্কারভাবে অবৈধ ঘোষণা করে রেখেছে। তাই কোন যুদ্ধকে

তখনই ইসলামী লড়াই বা জিহাদ বলা যাবে, যখন সেটা আল্লাহ'র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, আল্লাহ'র দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চালিত হবে। অধিকন্তু বেহেশতের আশা, চারিত্রিক শর্তাবলীর সংরক্ষণ ইসলামের বিধি-নিষেধের প্রতি কঠোর আনুগত্য হবে অনিবার্যভাবে পালিত। তবেই তাকে জিহাদ বলা যাবে।

সুতরাং জাতীয়তাবাদের লড়াই, গোত্র-গোষ্ঠী আর অর্থ-বিত্তের কারণে সংঘটিত যুদ্ধ-সংঘাতকে জিহাদ বলা যাবে না। যা বর্তমান কালে অহরহ ঘটে থাকে। এসব জঙ্গ-যুদ্ধ মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত হলেও তা ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ নয়; বরং ফিৎনা ফ্যাসাদ। এসব লড়াই ও সংঘাতের পতাকাবাহীরা ইসলামের দৃষ্টিতে মুজাহিদ নন; বরং অপরাধী, ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী, সন্ত্রাসী!

জিহাদ সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের বক্তব্য

জিহাদের এই হাকীকত ও মর্ম উপলব্ধিতে, মনে, স্মরণে রেখেই শ্রবণ করতে হবে জিহাদ সম্পর্কে আল-কুরআনের বাণীমালা! প্রথমেই সূরা হজের সেই আয়াতটি পেশ করছি, যাতে সর্ব প্রথম মুসলমানদেরকে জিহাদের অনুমতি দেয়া হয়েছিল এবং নির্দেশ দেয়া হয়েছিল—

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ط اَلَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ـ

'যেসব ঈমানদারদের সাথে ঈমান-দুশমন শত্রুরা যুদ্ধ বাধিয়ে রেখেছে এখন তাদের (ঈমানদারদের) কেও (সশস্ত্র) লড়াইয়ের অনুমতি দেয়া হল! কারণ, তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলা নিশ্চয় তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম– তাদেরকে অন্যায়ভাবে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে শুধু এই অপরাধে (?), তারা বলে ঃ আমাদের প্রভু একমাত্র আল্লাহ!'

অতঃপর জুলুম ও অত্যাচারের প্রতিরোধের উপকারিতা, গভীর হিকমত ও দর্শনের কথা আলোচিত হয়েছে। সত্য ও ন্যায়ের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার অনাদি-চিরন্তন সুন্নত ও রীতির কথা বিধৃত হয়েছে। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এই নির্যাতিত বিতাড়িত মানবগোষ্ঠী যাদেরকে তিনি সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দিচ্ছেন তাদের সম্পর্কে তিনি জানেন–

اَلَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ـ

(سورة الحج، ع/٦)

'এরা এমন লোক, যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীতে শাসনক্ষমতা দান করি তাহলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎ কাজের আদেশ করবে আর মন্দ কাজে বাধা দেবে। সব কিছুর শেষ ফল আল্লাহ'র হাতে।'

দুটি বিশেষ তত্ত্ব

সূরা হজের এই আয়াত কটিতে দুটি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠেছে। ১. সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি এবং এই যুদ্ধ-বিধানের মূল লক্ষ্য হলো-ওইসব জালিম ও অত্যাচারীদের শক্তির শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দেয়া– যারা হকের দাওয়াত, কল্যাণ ও সততার পথে বাধা দেয়; আল্লাহ'র বান্দাদেরকে তাঁর পথে চলতে দেয় না তাদেরকে নানাভাবে কষ্ট দেয়। সেই সাথে শাসনক্ষমতা যেন এমন লোকদের হাতে এসে পড়ে, যারা আল্লাহভক্ত, আল্লাহ'র অনুগত দাস; যারা সততা ও কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করবে; যারা মানুষকে অন্যায় ও অবিচার থেকে বিরত রাখবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, পরিস্থিতি যখন এমন হয়ে পড়ে যে, শক্তি ও বল প্রয়োগ ব্যতিত এইসব কল্যাণকর্ম ও মহান উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব নয় তখন এই মহৎ ও মহান লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে শক্তি প্রয়োগ মানব ও মানবতার জন্য হয়ে পড়ে অপরিসীম পুণ্যের কাজ!

দুই. বক্ষমাণ আয়াতটি থেকে আরেকটি বিষয় প্রতিভাত হয়ে ওঠে, মুসলমানদের যে দল ও গোষ্ঠীটি জিহাদ ও কুরবানী এই পবিত্রতম পথে অবতীর্ণ হবে তারা আল্লাহ'র দাসত্ব ও আনুগত্যে এতটা খাঁটি মুখলিস পরিপক্ব ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে যে, যদি এই সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর কোথাও তারা শাসন ব্যবস্থার মালিক হয়ে বসে তাহলে যেন তার প্রশাসনযন্ত্রের সমূহ মাধ্যম, সামগ্রিক শক্তি ও উপকরণকে রিপু ও নফসের চাহিদা পূরণে ব্যবহার না করে আল্লাহ'র গোলামি, সৎকর্মের প্রসার, সকল অবিচার ও অকল্যাণের নিপাত সাধন ও প্রতিরোধে ব্যায় করতে পারে। শাসন ও ধনভান্ডার হাতে আসলে যেন আল্লাহ'র বন্দেগী, দুনিয়ার সংশোধন ও কল্যান সাধন-ই হয় মূল টার্গেট।

দুঃখের বিষয় হলো, বর্তমান কালে মুসলমানগণ, সবিশেষ যেসব মুসলমানদের হাতে ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও রাজীনতি তারা আজ মহান এ লক্ষ্যকে ভুলে আছে। আজ তাদের, তাদের সামরিক কর্মকতা ও সিপাহিদের জীবনের কোথাও ইসলামের এই মহান লক্ষের বিন্দুমাত্র আঁচরও নেই।

মুজাহিদের গুণাবলী

অতঃপর সূরায়ে তাওবার সেই আয়াতটি শুনুন– যাতে আল্লাহ'র পথের মুজাহিদের মর্যাদা, বেহেশ্তের শুভসংবাদ সেই সাথে তাদের ঈমানী গুণাবলীর কথাও আলোচিত হয়েছে সবিস্তারে। ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ـ (سورة التوبة ـ ع/١١١) ١١٢/

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুমিনদের থেকে তাদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন বেহেশতের বিনিময়ে। (তারা যখন তাদের জান-মাল আল্লাহ'র কাছে বিক্রিই করে দিয়েছে তখন তারা) আল্লাহ'র পথে লড়াই করে, অন্যকে মারে এবং নিজেরাও মরে। (এই জীবন বিক্রেতা মুমিনদের জন্য আল্লাহ'র পক্ষ থেকে রয়েছে বেহেশত ও রহমতের অঙ্গীকার।) আল্লাহ'র ওপর এই অঙ্গীকার অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিত (তদীয় পবিত্র তিন গ্রন্থ–) তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে! আল্লাহর চাইতে ওয়াদা পূরণে অধিক সক্রিয় আর কে আছে? সুতরাং (হে ঈমানদারগণ!) তোমরা জান-মালের বিনিময়ে যে সওদা করেছ তার জন্য আনন্দিত হও! এটা অনেক বড় সফলতা। (আল্লাহ'র পথে লড়াইকারী এইসব মুমিনদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য হলো–) তারা নিজেদের অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী, ইবাদতে নিমগ্ন আল্লাহ'র প্রশংসাকারী, আল্লাহ'র জন্য, তাঁর দীনের জন্য তারা দেশের পর দেশ ঘুরে বেড়ায়। রুকু-সিজদা'র মাধমে আল্লাহ'র দরবারে বিনীত আনুগত্য প্রকাশকারী, সৎ কর্মের আদেশকারী, অন্যায় কাজে বাধাদানকারী, আল্লাহ'র পক্ষ থেকে নির্ধারিত সকল বিধি-নিষেধ যথার্থভাবে রক্ষাকারী! (হে নবী) সুতরাং আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন (যে, আমি তাদের জন্য আমার সন্তুষ্টি রহমত ও ভালোবাসা লিখে দিয়েছি।)

আল্লাহ'র প্রিয়জন

আল্লাহ'র পথে ইসলামের সাহায্যে যারা জীবন বিলায় অকাতরে, শির বাজি রেখে মরণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় তাদের সম্পর্কে সূরা 'সফ'– এ আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ۔ (صف ۔ ع/١/٤)

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা ভালবাসেন তাদেরকে যারা আল্লাহ'র পথে লড়াই করে সারিবদ্ধ হয়ে–যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।'

শহীদরা মরে না; তাঁরা অমর

আল্লাহ'র পথে লড়াই ও যুদ্ধ করার মর্যাদা এবং তৎপ্রতি তাকিদ ও উৎসাহদান প্রসঙ্গে বহু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। পবিত্র কুরআনের রুকুর পর রুকু পূর্ণ হয়ে আছে সেসব আলোচনায়। তন্মধ্য থেকে আমরা এখানে দুটি আয়াত তুলে ধরছি। আয়াত দু'টিতে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে, আল্লাহ'র পথে সংগ্রাম করে যারা জীবন বিলায় তাদেরকে তোমরা মৃত ভেব না! মৃত বলও না। তারা বরং আল্লাহ'র পক্ষ থেকে এক বিশেষ ধরনের জীবন লাভ করে। তারা সেখানে রকমারী নেয়ামত ও বিচিত্র সুখের আকাশে উড়ে বেড়ায়।

এ মর্মে সূরা বাকারায় ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتٌ ط بَلْ أَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ۔ (البقرة ۔ ع/١٩/١٥٤)

'যারা আল্লাহ'র পথে শহীদ হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বল না। তারা বরং জীবিত। তবে তোমরা তা টের পাও না।

সূরা আলে ইমরানে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا ط بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ط فَرِحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۔ (ال عمران ۔ ع/ ١٧/١٧٠)

'যারা আল্লাহ'র পথে জীবন দিয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত ভেব না। তারা বরং তাদের প্রভুর কাছে (ভিন্ন জগতে) জীবিতই আছে। তারা সেখানে রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছে। আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা খুশি-তৃপ্ত।'

زندہ ہوجاتے ہیں جومرتے ہیں حق کے نام پر
اللہ اللہ موت کوکس نے مسیحا کردیا ۔

প্রভুর নামেতে প্রাণ যে করেছে দান
লভেছে সেজন অমর জীবন!
ওগো দয়াময়, বিস্ময়ে মরি;
এ কেমন মরণ-অমর জীবন!!

হাদীস শরীফে জিহাদ ও শাহাদত

প্রিয় নবীজী (সা.) হাদীস শরীফেও জিহাদ এবং আল্লাহ'র পথে যুদ্ধ করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন যারপরনাই। এ সুবাদে আমরা কয়েকটি হাদীস এখানে পত্রস্থ করছি।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

لَغَدْوَةٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَور رَوْحَةٌ خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وما فِيهَا ۔ رواه البخارى و مسلم ۔

এক সকাল কিংবা এক বিকাল আল্লাহ'র পথে ব্যয় করা এই পৃথবী এবং পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।

হযরত আবদুর রহমান ইব্ন জুবাইর আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ ۔ رواه البخارى

'আল্লাহ'র পথে বান্দার যে কদম ধুলো মলিন হয় তাকে কখনো জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।'

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

اَلْقَتْلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْئٍ اِلَّا الدَّيْنَ ۔ رواه مسلم ۔

'আল্লাহ'র পথে শাহাদাত ঋন ছাড়া অন্য সকল অপরাধের কাফফারা হয়ে যায়।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا ولَهُ مَا فِي الاَرْضِ مِنْ شَيْئٍ اِلَّا الشَّهِيْدُ -يَتَمَنَّى اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلُ عَشَرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ ۔ رواه البخارى ومسلم

'বেহেশতে প্রবেশ করার পর পৃথিবীর সমগ্র নেয়ামতের বিনিময়ে হলেও কোন ব্যক্তি আর এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে না, তবে একমাত্র শহীদ! শহীদ বেহেশতে শাহাদাতের মর্যাদা অবলোকন করার পর পুনরায় এই পৃথিবীতে ফিরে এসে দশ দশবার শাহাদাত লাভ করতে চাইবে।'

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতিটি জিহাদে সশরীরে অংশ গ্রহণের আরজু ও তামান্না ব্যাক্ত করে ইরশাদ করেছেন–

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ اَنْ اُقْتَلَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيٰ ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيٰ ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيٰ ثُمَّ اُقْتَلُ ـ رواه البخاري ومسلم ـ

'ঐ মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমার মন চায় আমি আল্লাহ'র পথে শহীদ হই, তারপর আবার জীবিত হই, তারপর আবার শহীদ হই; তারপর আবার জীবিত হই তারপর আবার শহীদ হই; তারপর আবার জীবিত হই তারপর আবার শহীদ হই।'

আল্লাহ'র নামে আল্লাহ'র পথে লড়াই–যুদ্ধ অতঃপর শাহাদাত লাভের অবিনশ্বর মর্যাদা উপলব্ধি করার জন্য অবশ্য এই একটি হাদীস-ই যথেষ্ট! কারণ, এতে দিবালোকের মত ভাস্বর হয়ে উঠেছে, স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ও এই তামান্না ও আকাঙ্খা করতেন, আল্লাহ'র দীনের খাতিরে সংঘটিত প্রতিটি যুদ্ধে শরীক হতে, আল্লাহ ও সত্যের দুশমনদের তলোয়ারের আঘাতে শহীদ হতে! শুধু একবারই নয়, বারবার শহীদ হতে চেয়েছেন তিনি!

می خواہم زخدا بدعا صد ہزاراں جاں

تاصد ہزار بار بمیرم برائے تو –

হাজার প্রাণের আর্জি আমার
যাচি তব পাক সকাশে,
হাজার প্রাণে হাজার বারে
মরি যেন তোমার তরে ॥

সারকথা হলো, যাবতীয় শর্তাবলী এবং শরীয়ত নির্ধারিত নীতিমালার ভেতরে থেকে আল্লাহ'র পথে লড়াই করাও রাসূলে কারীম (সা.)-এর একটি কাজ। দীনী দাওয়াত, তা'লিম, তাযকিয়া, ইসলাহ ও সংশোধন ও সৎ কাজের আদেশ, অন্যায় কাজে বাধা দানের মতোই অবশ্যপালনীয় অনিবার্য কর্তব্য। এখন উম্মতে মুহাম্মাদীর কর্তব্য হলো, তাদের নবীর রেখে যাওয়া এসব উত্তারিধাকারকে সযত্নে লালন করা; পতাকা স্বহস্তে তুলে নেয়া এবং যথাযথ দায়িত্বের সাথে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া।

জিহাদ এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

বিপ্লব ও আযাদীর চির-উজ্জল পাঠশালা দারুল উলূম দেওবন্দের প্রত্যক্ষ সন্তান॥

পরিচয় ঃ 'জিহাদ' আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হল রণক্ষেত্রে কিংবা বাকযুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ শক্তি ঢেলে দেয়া। ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ হল, ইসলামের সাহায্য ও আল্লাহর দ্বীনকে সব কিছুর উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে নিবেদিত যুদ্ধ। *১ ইসলামের ঝাণ্ডা সমুন্নত করা ও রাখার লক্ষ্যে নিবেদিত এই জঙ্গ-জিহাদের মর্যাদা ইসলামে অপরিসীম। এ পথে যাঁরা জীবন বিলায় ইসলামের ভাষায় তাঁরা অমর; *২ বেহেশতের দরোজা তাঁদের জন্যে সদা উন্মুক্ত। *৩ এবং এর কারণও আছে।

যৌক্তিকতা ঃ মানব জাতির প্রতি মহান প্রভুর অনুগ্রহ অসীম। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের আগমন তন্মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ, যদি নবী-রাসূলগণের আগমন না ঘটতো তাহলে এই পৃথিবীর মানুষেরা আল্লাহ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারতো না। মহান মালিকের খুশী-অখুশীর সন্ধান পেতো না। অধিকন্তু তাঁর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে সফল-স্বার্থক জীবন রচনার পথও বাতলে দেয়ার ছিল না কেউ। আলো-আঁধার, সফলতা-ব্যর্থতা আর সত্য-মিথ্যার ফারাক থাকতো চিররুদ্ধ। জীবন পদ্ধতি, ইহকাল-পরকাল, ফকিরী-দরবেশী, শাসন-প্রশাসনের দীক্ষা পেতো না মানুষ। তাছাড়া মসজিদের ছেঁড়া চাটাইয়ে বসেও যে অর্ধজাহান শাসন করা যায় একথাই বা কে শেখাতো! কায়সার ও কিসরার সিংহাসন উল্টে দেবার মহামন্ত্র কে শেখাতো এই মাটির মানুষকে! রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমে থাকা আকা, আকাশ পংকিলতা, যুলুম, নির্যাতন

আর পাশবিকতার কবর রচনা করে সেই মাটিতেই আবার মানবতার সফল চাষ করার মত বিরল ও বিস্ময়কর দর্শন হযরাতে আম্বিয়ায়ে কেরাম ছাড়া এই পৃথিবীকে আর কেউ দিতে পারেনি। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি নবুওয়াতের হিদায়াত ও আলো ব্যতীত শুধু অক্ষমই নয়, অনর্থকও বটে। সুতরাং আম্বিয়ায়ে কেরামের আগমন মানব জাতির প্রতি কত বড় অনুগ্রহ সেকথা ভাষায় ব্যক্ত করা সাধ্যাতীত।

চোখ যতোই দৃষ্টিসম্পন্ন হোক সূর্যের আলো ছোঁয়া ব্যতীত তা অর্থহীন। তদ্রূপ মানুষের বিবেক-বুদ্ধি যত প্রখরই হোক না কেন নবুওয়াতের হিদায়াত ব্যতীত তা ভাল-মন্দ ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ে ব্যর্থ। অন্ধকার অমাবস্যার রাতে যেভাবে চোখশক্তি অকার্যকর; ভ্রান্তি ও গোমরাহীর তিমির নিশীথেও বিবেক-বুদ্ধি সম্পূর্ণ অচল-অকার্যকর।

বিবেক-বুদ্ধিও মানুষকে পথ দেখায়, তবে তা অসম্পূর্ণ-চূড়ান্ত ফলাফল পর্যন্ত পৌঁছুতে অক্ষম। মহান প্রভুর পবিত্রতম নামাবলী, গুণাবলী ও তাঁর সন্তুষ্টি-অসুন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছার ক্ষমতা মানুষের বিবেক-বুদ্ধির নেই এটাই স্বাভাবিক। অথচ মহান মালিকের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির উপলব্ধি ছাড়া মানব জাতির সফলতা লাভ অসম্ভব। আর অসম্ভব বলেই জীবনের সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো মহান আল্লাহর মহান সত্তার, তাঁর সত্য-সুন্দর গুণাবলী ও তাঁর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির পথ আবিষ্কার করা। এবং সে জন্য প্রয়োজন হযররাতে আম্বিয়ায়ে কেরামের হেদায়াত ও রাহ্‌নুমায়ী। এই হেদায়াত পথ-প্রদর্শন ও রাহুনমায়ীর লক্ষ্যেই নবী-রাসূলের আগমন। *[৪] যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ এসেছেন। আকাশ-যমিনের মালিক, জীবন ও মৃত্যুর প্রভু মহান মাওলার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির কথা বলেছেন। বলেছেন– পারস্পরিক আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্যের কথা; সততা, ন্যায়-নীতি ও মানবতার কথা।

যাঁরা ভাগ্যবান, স্বচ্ছ হৃদয় ও চিন্তার অধিকারী তাঁরা নবী-রাসূলগণের এই আহ্বানকে শতকাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তির মত লুফে নিয়েছেন। পার্থিব ক্লেদ ও পংকিল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে উঠেছেন। স্বীয় কামনা-চিন্তা ও স্বপ্ন তাড়নাকে পদদলিত করে দাঁড়িয়েছেন এসে নবীগণের ছাউনি তলে। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ কর্ম-চিন্তা সকল কিছু নতুন করে সাজিয়ে নিয়েছেন আম্বিয়ায়ে কেরামের চিন্তা ও শিক্ষার আলোকে। আর যারা ছিল চিরভাগ্যাহত তারা পরম করুণাময়ের এই অসীম অনুগ্রহকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছে। আল্লাহর যমিনে বসবাস করে তাঁরই বিধানাবলীকে মনে করেছে অযাচিত বোঝা, অস্বীকার করেছে মালিকের পথ ও দর্শন। চতুষ্পদ জন্তুর মত মন ও রিপুর আনুগত্যকে মনে করেছে সুখকর স্বাধীনতা। মালিক ও সৃষ্টিকর্তার আনুগত্যকে মনে করেছে নির্বুদ্ধিতা আর জ্বলন্ত বোকামি।*[৫]

তারা বরং নিজের অসম্পূর্ণ বিবেক-বুদ্ধিকে পরিপূর্ণ বিশ্বস্ত গাইড মনে করেছে। তারা বুঝতে অক্ষম হয়েছে, এই বিশ্ব জাহান, আকাশ-বাতাস, পানি-মাটি, পাহাড়-পর্বত, গাছ-গাছালী, ঝর্ণা-ফোয়ারা, নদ-নদী আর বিচিত্র সৃষ্টিলীলায় চিত্রায়িত এই পৃথিবীর সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা যিনি তিনি আমার সর্বোচ্চ মনিব ও মালিক। সুতরাং তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্যলাভের মত সফলতা ও স্বার্থকতার আর কিছু নেই! কিন্তু তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি। পার্থিবতার রঙিন স্বপ্ন-ঘোর কাটাতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। নশ্বর এই জগতের মোহ ছন্দ জয় করতে তারা সীমাহীন অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশাল-বিস্তীর্ণ জগতের মহান অধিপতির আনুগত্য লাভের নিগূঢ়-অনন্ত মর্যাদা উপলব্ধিতে তারা অসাধারণ দৈন্যের পরিচয় দিয়েছে। বরং অতিরিক্ত বোকামি আর অতিশয় নির্বুদ্ধিতাবশত রিপু ও শয়তানের আনুগত্য করেছে। আল্লাহর সম্মানিত প্রতিনিধিগণকে অস্বীকার করেছে; মিথ্যারোপ করেছে। অবতীর্ণ হয়েছে নির্লজ্জ শত্রুতায়। আগ-পর বিবেচনাশূন্য এই হতভাগ্য মানবগুলো আল্লাহর মহান মনিবের বন্ধুগণকে সঙ্গী করতে অপমানবোধ করেছে আর তাঁর শত্রুদেরকে বন্ধু করতে বোধ করেছে বিপুল সম্মান ও গৌরব! এহেন বোকা ও নির্বোধের প্রতি কার অনুগ্রহ হবে না? কে তাদের প্রতি করুণানমিত হবে না?

নবীগণ রীতিমতোই তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখেছেন! দয়ার্দ্র পিতা আর মমতাময়ী জননী যেভাবে অবাধ্য সন্তানকে সভ্য ও মানুষ করতে সাধ্যের সবটুকু মেহনত ঢেলে দেন হযরাতে আম্বিয়ায়ে কেরামও তেমনিভাবে সাধ্যের সবটুকু সামর্থ্য ঢেলে চেষ্টা করেছেন পথহারা অবাধ্য মানুষগুলোকে পথের সন্ধান দিতে।*৬

তাঁদের কারো কারো সেই নিখাঁদ দরদসিক্ত সাধনার কথা বিধৃত হয়েছে পবিত্র কুরআনে এইভাবে–

قَلَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلاً وَنَهَارًا* فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِىْ اِلاَّ فِرَ
ارًا * وَاِنِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْا اَصَابِعَهُمْ فِىْ اٰذَانِهِمْ
وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوْا اسْتِكْبَارًا ـ (نوح/ ٥-٧)

(হযরত নূহ (আ.)) আরয করলেন ঃ হে আমার রব! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবা-নিশি (তোমার পথে) ডেকেছি, অথচ আমার আহ্বান তাদের পলায়নপরতাকেই কেবল বৃদ্ধি করেছে। আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এই প্রত্যাশায় যখনই আমি তাদেরকে ডেকেছি–ঘৃণায় তারা কানে অঙ্গুলি দিয়ে রেখেছে এবং বস্ত্রাবৃত হয়ে রয়েছে আর প্রদর্শন করেছে প্রচণ্ড অবাধ্যতা।*৭ *(নূহ ঃ ৫-৭)*

সারকথা হল, মানব জাতির পথের দিশা ও মনযিলের সন্ধান দেয়ার লক্ষ্যেই আবির্ভূত হোন নবী-রাসূলগণ। অতঃপর জীবনের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়ে বর্ণনাতিত ধৈর্য, অসীম মমতা আর ভালবাসা দিয়ে তাঁরা রচনা করেন উম্মতের মুক্তির পথ। যাদের মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রামী তাঁরা –তাদের হাতেই হোন নির্যাতিত, নিগৃহীত, রক্তাক্ত- এমনকি নির্বাসিতও। তবুও এক চুল সরে দাঁড়ান না। এবং ধীরে ধীরে যারা প্রকৃতস্থ, সুস্থ, ভাল-মন্দ বিচার করতে সক্ষম তাঁরা এসে শামিল হোন নবী-রাসূলগণের সামিয়ানায়। শপথ নেন তাঁরাও সত্য গ্রহণের, বাস্তবায়নের ও প্রচারের। আর যাদের ভেতর অন্ধ, হৃদয় কপাট চিররুদ্ধ, ভাল-মন্দ নির্ণয়ে অক্ষম তারা তেড়ে আসে। নিভিয়ে দিতে চায় সত্যের প্রদীপ। আচ্ছা, ওই মূর্খ অর্বাচীনদের কি এই সুযোগ দেয়া যায়? তাহলে তো সমগ্র পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে যাবে। সুতরাং তখন বাধ্য হয়েই এই পৃথিবীর মালিক তাঁর ঘর– এই বিশ্ব বসুন্ধরাকে আলোকিত করার সিদ্ধান্ত নেন আর আলোর শত্রু সকল অন্ধ-বেইমানকে খানিকটা শায়েস্তা করার ব্যবস্থা নেন। মূলত এটাই জিহাদ! অপরাধীদেরকে সুস্থ করার কিংবা তাদের পীড়ন থেকে সুজনদের পরিত্রাণ দেবার এই যৌক্তিক ও অনিবার্য যুদ্ধ-জিহাদকে যারা অপরাধ মনে করে তাদেরকে মূর্খ, নির্বোধ ও অপ্রকৃতস্থ মনে করলে কি খুব বেশি কিছু মনে করা হবে?

জিহাদের লক্ষ্য ঃ জিহাদের লক্ষ্য হলো, ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, আল্লাহ'র দ্বীনের বিজয়বিধান ও কুফরী শক্তিসমূহের পতন সাধন।*[৮] এটাই জিহাদের মূল লক্ষ্য।

জিহাদের উপমা ঃ পশ্চিমা ইহুদী-খৃষ্টানরা ইসলামের যে কোন বিধানকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনে সদাসংকল্প এবং তৎপর। এক্ষেত্রে তাদের পটুতা ও দক্ষতারও কোন জুড়ি নেই। ইসলামের বিমল-স্বচ্ছ-স্ফটিক ধারা ঘোলারূপে উপস্থাপন অতঃপর বক্রমনের মৎস্য শিকারে তাদের উপমা তারাই। তাদের এই মজ্জাগত স্বভাবমতেই ইসলামের অন্যান্য বিধানের মত পবিত্র জিহাদকেও কলুষিত করতে কার্পণ্য করেনি তারা; বরং পৃথিবীময় ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করেছে 'ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করেছে তলোয়ারের জোরে।' এ ছিল প্রাচীনকালের ইহুদী থিউরি। সেই একই থিউরির নব্য স্লোগান হল, জিহাদ মানে সন্ত্রাস। মুজাহিদ অর্থ সন্ত্রাসী। আর ইসলাম হলো একটি সন্ত্রাসী মতবাদ। শত্রুতো শত্রুই। দুঃখ হলো, শত্রুদের এই স্লোগানে প্রভাবিত হয়ে কিছু বন্ধু মুসলমানও সংশয় পোষণ করতে শুরু করেছে- জিহাদ কি আসলেই সন্ত্রাস!?

তাদের এ সংশয়েরও কারণ আছে। আমাদের পরাজিতচিন্তার কিছু মুসলিম মনীষী পর্যন্ত শত্রুদের এই স্লোগানে বেশ প্রভাবিত হয়েছেন। এবং ইসলামী চিন্তা

ও গবেষণার নামে একান্ত দরদসুলভ কণ্ঠে বিনীত ভাষা ও স্বরে ওযরখাহী করার চেষ্টা করেছেন– ইসলাম ও মুসলমানের পক্ষ থেকে। তারা বড় কাকুতির সুরে বুঝাতে চেয়েছেন– মূলত ইসলামে জিহাদ বা লড়াই-যুদ্ধ বলতে কিছুই নেই। একান্ত ঠেকায় পড়ে বাধ্য হয়ে অস্তিত্বের সার্থে মাঝে মধ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। এটা একান্তই প্রতিরক্ষামূলক।*৯ অন্যথায় ইসলাম শুধুই শান্তির ধর্ম; ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন শান্তি ও নিরাপত্তার মূর্তপ্রতীক– সারা জাহানের রহমত।

মূলত এই নতজানু মানসিকতা ও পরাজিত চিন্তার মূল ভিত্তি দুটি—

এক. জিহাদের মৌল দর্শন ও নিগূঢ় প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা।

দুই. নিজস্ব ধর্ম-দর্শনের প্রতি প্রত্যয় বিশ্বাসের অভাব এবং অতিশয় উদারতা।

এটা সন্দেহাতীত সত্য, ইসলাম অর্থই শান্তি ও ইসলাম শান্তি, শৃংখলা, ন্যায়, নিরাপত্তা, অনুগ্রহ, মমতা, সাধুতা ও মানবতার ধর্ম। তাই ইসলামে হিংসা-বিদ্বেস, মারা-মারি, হানা-হানি, ত্রাস, নৈরাজ্য, রক্তারক্তি ইত্যাকার কর্ম ও চিন্তার অবকাশ নেই। কিন্তু জিহাদ কি সে ধরনের কোন রক্তারক্তির মধ্যে পড়ে (?) সেটাই দেখার বিষয়!

বিষয়টি আমরা একটি উপমার মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারি। যেমন ধরুন, এক ব্যক্তির হাতে একটি ফোঁড়া উঠল। এখন এর চিকিৎসার তিনটি পর্যায় আছে। এক. এমন কোন ঔষধ বা প্রলেপ ব্যবহার করা, যাতে এর ভেতরকার বিষাক্ত কিংবা দূষিত অংশটা হয়তো পেকে বেড়িয়ে যাবে অথবা ভেতরেই মিশে যাবে। দুই. যদি না শুকিয়ে পেকে যায় তখন ফাটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তিন. যদি ফোঁড়া পেকে বিস্তৃত হতে থাকে এবং শরীরে পচন বৃদ্ধি করতে থাকে তখন সেটা অপারেশন করতে হবে এবং পচা অংশটা কেটে ফেলে দিতে হবে।

সুতরাং এখন যদি কোন সুচিকিৎসক কারও শরীরের কোন পচা অংশকে কেটে ফেলে দেয় তাহলে রোগীর আত্মীয়-স্বজন সকলেই এই চিকিৎসককে কৃতজ্ঞতা জানায়, ধন্যবাদ দেয়। অধিকন্তু উঁচু মূল্যের ফিস ও সম্মানী দেয়। আজীবন তার প্রশংসা করে। কারণ, সে এই গলিত অংশটা কর্তন করে শরীরের অবশিষ্ট অংশগুলোকে বাঁচিয়েছে। পৃথিবীর কোন সুস্থ মানুষ চিকিৎসকের এই কাটা-কুটির আচরণকে অত্যাচারী কিংবা পাশবিক আচরণ বলে না। অনুরূপভাবে হযরাতে আম্বিয়ায়ে কেরাম হলেন মানব জাতির আত্মিক চিকিৎসক। আল্লাহ তাঁর এই বিশাল জগৎ সংসারের সুস্থতা বিধানের জন্যই পাঠিয়েছেন নবী-রাসূলগণকে। তাই মানব সংসারে যখন কুফুরী ও অবাধ্যতার ফোঁড়া দেখা দেয় তখন ওয়ায ও উপদেশের প্রলেপ মেখে তাকে সুস্থ করতে চেষ্টা করেন তাঁরা। যদি এই প্রাথমিক চিকিৎসায় কাজ না হয় বরং তা অন্য সুস্থ অঙ্গগুলোকে (ঈমানদারগণকে) পর্যন্ত বিনষ্ট ও পচনমুখী করবার উপক্রম হয় তখন সেই

গলিত অংশটি কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়– যাতে মানব সংসারের অবশিষ্ট অংশগুলো সুস্থ থাকে এবং জগৎ সংসারের এই গলিত অংশটি চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যায়।*[১০]

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) বিষয়টি আরেকটু খোলাসা করে আলোকপাত করেছেন এইভাবে– জিহাদ হলো একটি অপারেশনের মত বিষয়। কারণ, রোগ দুই প্রকার ঃ সংক্রামক ও অসংক্রামক। অসংক্রামক ও স্থির ব্যধিকে জায়গায় রেখে চিকিৎসা করে দূর করা যায়। কিন্তু যেটা সংক্রামক ও সম্প্রসারক–ক্রমশ ছড়িয়ে পরার মত– সেটার দ্রুত অপারেশন করে জীবাণুটা বের করে ফেলতে হয়। কারণ, সেটাকে শরীরে অবস্থান করতে দিলে শরীরের সুস্থ অংশটাও দ্রুত আক্রান্ত হয়ে পড়বে।

ইসলামের শত্রুরাও দুই প্রকার। এক প্রকার শত্রু হলো যাদের সাথে সন্ধি করা যায় এবং সন্ধি হয়ে গেলে তারা আর অনর্থক বিপর্যয় সৃষ্টি করে না। এদের সাথে জিহাদের প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয় প্রকার হল এমনসব চিরবক্র ও রুগ্ন শত্রু যাদের মধ্যে শলা-সন্ধির কোন ক্ষমতাই নেই। কোনভাবেই তাদের সাথে সন্ধি-চুক্তি করা যায় না। এই সংক্রামক ও সম্প্রসারক অংশের অপারেশনের বিকল্প নেই। আর এই অপারেশনই হলো জিহাদ। সুতরাং জিহাদের লক্ষ্য আদৌ কাউকে মুসলমান বানানো নয়– বরং মুসলমানগণকে সংরক্ষণ করাই এর মূল উদ্দেশ্য।*[১১]

এবং এটা একান্তই ভিত্তিহীন অভিযোগ, ইসলাম তলোয়ারের মাধ্যমে সম্প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ, ইমলাম গ্রহণে বাধ্য করাই যদি জিহাদের লক্ষ্য হতো তাহলে যুদ্ধ বিরতির জন্য জিয্য়া বা কর আদায়ের প্রথা অনুমোদিত হতো না। তাছাড়া হযরত (সা.)-এর যুগ থেকে বিশ্বময় কত জিহাদই তো সংঘটিত হয়েছে, পৃথিবীর কত মাটিই তো লাল হয়েছে জিহাদের তপ্ত আহ্বানে, কিন্তু একথা কি কেউ ইতিহাসের পাতা থেকে প্রমাণ করতে পারবে, ইসলামের এই চৌদ্দশ বছরের দীর্ঘ পরিসরে একজন কাফেরকেও ইমলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে! বরং ইতিহাস এ কথারই প্রমাণ করে, মুসলমানগণ যখনই কোন দেশ যুদ্ধ করে জয় করেছেন তখন প্রসন্ন বদন ও চিত্তে সে এলাকার অধিবাসীদেরকে তাদের ধর্মের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। অতঃপর প্রমাণসিদ্ধ দওয়াত এসেছে। উন্নত জীবনবোধ, সুরভিত চরিত্র সৌন্দর্য ও চিত্তাকর্ষক কর্মকাণ্ড ইসলামের অপার নীতি সৌকর্য তাদের হৃদয়-মন-বিশ্বাস-অনুভূতিকে সজোরে টেনে এনেছে। তাদের অতীত অন্তঃসারশূন্য যুক্তিহীন চিন্তা-বিশ্বাস ইসলামের শক্তিমান আলোকিত সত্যের কাছে পরাজিত হয়েছে আর তারা রূপান্তরিত আত্মার আবেদনেই বিগলিত মন ও বিশ্বাসে বলে উঠেছে- আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ....।*[১২]

অধিকন্তু একথা বলারও অবকাশ নেই, মানব নিধনের লক্ষ্যেই মুসলমানগণ জিহাদ করেন। কারণ, একথা সকলেই জানে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন তারা ছিল দুর্ধর্ষ হিংস্র, লড়াকু আরবগোষ্ঠী। মূর্তিপূজক, অগ্নিপূজক, ইহুদী-খৃষ্টান ও বিবেকপূজারী সকলের সাথেই তাঁর যুদ্ধ হয়েছে। প্রিয় নবীজীর আমলেই যুদ্ধ হয়েছে প্রায় ৬২টি। এর মধ্যে প্রায় ২৭টিতে হযরত (সা.) নিজে উপস্থিত ছিলেন।*[১৩] অথচ সুদীর্ঘ এই যুদ্ধ-জিহাদে উভয় পক্ষের লাশের সংখ্যা মাত্র আঠারশ'।

এটাকে একান্ত বিস্ময়করই বলতে হবে, কিংবা বলতে হবে হযরত (সা.)-এর জীবন্ত মু'জিযা যে, একটি রক্তপিপাসু, যুদ্ধবাজ, বর্বর, শিক্ষা ও আদর্শবিমুখ বিশৃংখল জাতিকে একটি সম্পূর্ণ নিরাপদ, সুশৃংখল, সুসংহত, আইনসিদ্ধ ও আদর্শের কাছে সমর্পিত দশ লক্ষ বর্গ মাইলব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্য শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে জান দিতে হয়েছে মাত্র আঠার'শ মানুষকে। তাও শত্রু-মিত্র উভয় পক্ষের। এবং এই আঠার'শ নিহতের মধ্যে তারাও শামিল, বনূকুরাইজার যেসব ইহুদীকে তাদেরই লোকেরা তাদেরই আইনমতে বরবাদ করে দিয়েছিল।*[১৪]

আশ্চর্য হলেও সত্য, আজ যেসব কথিত উন্নত দেশ ও গোষ্ঠী– যারা বিশ্বময় মানবতার ফেরী করে বেড়ায়, যারা আন্তর্জাতিক মানবতার এজেন্সী খুলে বসে আছে, তাদের উন্নত (?) দেশের পথে-প্রান্তরে দৈনন্দিন বিচ্ছিন্ন ঘটনায় মৃতের সংখ্যাও এর চেয়ে বেশি। এবং অতিহাস্যস্পদ ঘটনা হলো, গেল দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে তিন কোটিরও বেশী লাশের নাজরানা দিয়ে যারা পৃথিবীর এক ইঞ্চি মাটিতেও পূর্ণাঙ্গ শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারল না তারাই ক্যানভাস করে বেড়ায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) খুনী এবং ইসলাম খুনের ধর্ম-সন্ত্রাসের ধর্ম।*[১৫] বড়ই বিচিত্র তাদের দৃষ্টি, ভীষণ রঙ্গীলা তাদের মানবতা! তাদের সে মানবতার ত্রাসে পৃথিবীর অসহায় দুর্বল সকল মানবগোষ্ঠী সকাল-সন্ধ্যা মুক্তি প্রার্থনা করে ফিরে বিশ্ব জাহানের মালিকের দরবারে!!

জিহাদ রহমতের নবীর জীবনে ঃ পবিত্র কুরআনে হযরত (সা.)-কে ভূষিত করা হয়েছে সারা জাহানের 'রহমত' খেতাবে।*[১৬] তাই রহমতের নবী, শান্তির নবী, আদর্শের নিরাপত্তার ও শৃংখলার মহান প্রতিষ্ঠাতা তিনি। আর সে কারণেই তাঁকে একদিকে যেমন শান্তি রহমত ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় সামর্থ্যের সবটুকু শক্তি বিলিয়ে দিয়ে চালিয়ে যেতে হয়েছে দাওয়াত। অতঃপর সেই দাওয়াতে সাড়া দিয়ে যাঁরা শরিক হয়েছে তাঁর রহমতের মিছিলে– সোনার মানুষ হিসেবে তাঁদেরকে গড়ে তুলতে সার্বক্ষণিক শ্রম দিতে হয়েছে তাঁকেই। অবশেষে যারা এই রহমতের কাফেলার পথ আগলে ধরেছে, বাধা দিয়েছে রহমত ও শান্তি প্রতিষ্ঠায়, সত্যসন্ধানীদের জীবনকে করে তুলেছে অতিষ্ঠ-বিষাক্ত তখন

মানবদেহের এই বিষ ফোঁড়াগুলো উপড়ে ফেলার অনুমতি দেয়া হয়েছে তাঁকে– বিশ্বময় রহমত প্রতিষ্ঠার স্বার্থে। ইরশাদ হয়েছে–

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ـ وَإِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ * اَلَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّاأَنْ يَّقُوْلُوْا ـ رَبُّنَااللّٰهُ وَلَوْ لَادَفْعُ اللّٰهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوٰتٌ وَّمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَااسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ *

'যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে তাঁদেরকে যাদের সাথে কাফের সম্প্রদায় লড়াই করে। কারণ, তারা অত্যাচারিত হয়েছে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। তাদেরকে অন্যায়ভাবে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের অপরাধ শুধু এইটুকু, তারা বলে ঃ আল্লাহ-ই আমাদর প্রভু! আল্লাহ তাআলা যদি মানব জাতির একদল দ্বারা অন্য দলকে দমন না করতেন, (অর্থাৎ যদি যুগে যুগে হক পন্থীদেরকে বাতিল পন্থীদের ওপর বিজয়ী না করতেন) তাহলে ধ্বংস হয়ে যেত খৃষ্টানদের উপাসনালয়, গীর্জা, ইহুদীদের ইবাদতখানা এবং মসজিদসমূহ– যেখানে প্রতিনিয়ত আল্লাহ'র নাম উচ্চারিত হয়। যে আল্লাহকে সাহায্য করে আল্লাহ নিশ্চয় তাকে সাহায্য করেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহান শক্তিমান পরাক্রমশীল।*[১৭]

অর্থাৎ সুদীর্ঘকাল কেবল অনুগ্রহ, দয়া ও ক্ষমার ওপর দাঁড়িয়ে*[১৮] আল্লাহ'র পথে ডাকতে ডাকতে যখন অত্যাচারের সীমানা পার হয়ে গেল, একান্ত অন্যায়ভাবে স্বীয় ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হল সত্যকে সত্য আর মিথ্যাকে মিথ্যা বলার অপরাধে, তখন সত্য রক্ষার খাতিরে এই আয়াতের মাধ্যমে প্রিয় নবীজী (সা.) এবং তার নির্যাতিত সঙ্গীগণকে রুখে দাঁড়াবার অনুমতি দেয়া হল।*[১৯]

এটা ছিল জিহাদ অনুমোদনের প্রথম স্তর। আল্লামা যুরকানী (রহ.) বলেছেন; এটা হিজরী তৃতীয় সনের ১১ই সফরে অবতীর্ণ বিধান।*[২০] অর্থাৎ স্বীয় ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বিতাড়িত হবার দীর্ঘ তিন বছর পর মুসলমানগণ রুখে দাঁড়াবার এই অনুমতি লাভ করেন। কোন আদেশ নয়। তার মানে, ইচ্ছে করলে তারা মোকাবিলা করতে পারে। আল্লাহ'র পক্ষ থেকে অনুমতি আছে। বাধা নেই, আদেশও নেই। অবশ্য কারও কারও মতে হিজরতের প্রথম সালেই জিহাদের আয়াত অবতীর্ণ হয়!*[২১]

তারপর আয়াত নাযিল হয় আদেশসূচক। তবে প্রতিরক্ষামূলক। আক্রমণাত্মক নয়। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۔

‘তোমরা আল্লাহ’র পথে জিহাদ কর তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।*[২২]

এই আয়াতের মাধ্যমে হযরত প্রিয়নবী (সা.)কে প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের আদেশ দেয়া হয়। এবং মুসলমানদের ওপর জিহাদের বিধানকে করা হয় ‘ফরয–’ অবশ্য কর্তব্য বিধান।*[২৩]

সবশেষে আদেশ করা হলো সকল শ্রেণীর কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার চাই তারা যুদ্ধের সূচনা করুক আর নাই করুক। হয় তো ইসলাম গ্রহণ করবে নয় কর দিয়ে ইসলামের সামনে মাথানত করবে। তৃতীয় কোন পথ আর খোলা রইলো না। মূলত এটাই হলো জিহাদের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ। এর মাধ্যমেই কুফূরী শক্তি দর্পের পতন ঘটেছে, সমুন্নত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আল্লাহ’র দীনের মর্যাদা। বরকতময় রহমতপূর্ণ জিহাদী বিধানের এই পূর্ণতা সাধিত হয় নবম হিজরীর হজ সমাপনের চার মাস পর। অবশ্য হজ মৌসুমেই সায়্যিদুনা আলী (রা.) এর মাধ্যমে এর ঘোষণা দিয়ে দেয়া হয়েছিল।*[২৪] অতঃপর পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয়–

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۔ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۔

‘সম্মানিত মাসগুলো পার হবার পরই মুশরিকদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে, পাকড়াও করবে, ঘেরাও করবে এবং তাদের শিকারে সকল ঘাঁটিতে অবস্থান গ্রহণ করবে। হ্যাঁ, তারা যদি তাওবা করে ফিরে আসে, যথাযথভাবে নামায আদায় করে, যাকাত দেয় তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।*[২৫] অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۔

'যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল কর্তৃক কৃত হারামকে হারাম মনে করে না এবং যেসব আহলে কিতাব সত্যদীনকে দীন হিসেবে গ্রহণ করে না– লাঞ্ছিত হয়ে সহস্তে কর না দেয়া পর্যন্ত।*[২৬] সবশেষে আরও পরিষ্কার ভাষায় ঘোষিত হয়েছে– وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ

'ফিৎনা দূরীভূত হয়ে সামগ্রিকভাবে আল্লাহ'র দীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাক।*[২৭]

আল্লাহ তাআলারপক্ষ থেকে প্রাপ্ত এই আদেশ পালনে হযরত (সা.) ছিলেন সদা উদগ্রীব। মানব জাতির কল্যাণ ও সফলতা কামনায় তিনি যেমন ছিলেন সদাব্যস্ত, অধীরচিত্ত আল্লাহ'র পথে জীবন বিলাতেও তাঁর আগ্রহ ছিল বর্ণনাতীত। এ মর্মে সাহাবী আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْلَا اَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا تَطِيْبُ اَنْفُسُهُمْ اَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّىْ وَلَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُ اَنْ اُقْتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيٰى ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيٰى -

'রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ সেই সত্তার কসম, যাঁর কুদরতী হাতে আমার জীবন! যদি এমন মুসলমান না থাকতো, যাদের পক্ষে আমি যুদ্ধে চলে যাবার পর ঘরে বসে থাকা অসহ্যকর –অথচ তাদেরকে যুদ্ধে নিয়ে যাওয়ার জন্য সওয়ারির ব্যবস্থা করার সামর্থ্যও আমার নেই– তাহলে আমি আল্লাহ'র পথে যুদ্ধরত প্রতিটি দলেই শরিক হতাম! সে সত্তার কসম- যাঁর কুদরতী হাতে আমার জীবন! আমার একান্ত ইচ্ছা হয়, আমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব আর শহীদ হবো আবার জীবিত হবো; আবার আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শহীদ হবো; আবার জীবিত হবো; আবার যুদ্ধ করে শহীদ হবো।*[২৮]

তিনি (সা.) আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'জিহাদ হলো ইসলামের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।'*[২৯]

অন্য একটি বর্ণনায় আছে, সাহাবী আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন ঃ

قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادُ ؟ قَالَ اِنَّكُمْ لَا تَسْتَطِيْعُوْنَهٗ - فَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ - مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِثْلَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الَّذِىْ لَا يَفْتُرُ مِنْ صَلَاةٍ وَّلَا صِيَامٍ حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

'রাসূলুল্লাহ (সা.)কে প্রশ্ন করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিহাদের সমতুল্য কোন আমল আছে কি? তিনি ইরশাদ করলেন ঃ সে আমলের ক্ষমতা তোমাদের নেই! তাঁরা দুইবার কিংবা তিনবার একই প্রশ্ন করলে নবীজী একই জবাব দেন। অতঃপর তৃতীয়বার বলেন ঃ আল্লাহ'র পথের মুজাহিদদের সমতুল্য কেবল সেই ব্যক্তি, যে সর্বদা রোযা ও নামাযে মশগুল থাকে এবং মুজাহিদ জিহাদ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত এক মূহূর্তের জন্যও রোযা-নামায থেকে বিরতি গ্রহণ করে না।'

হযরত (সা.) যে শুধু জিহাদের মর্যাদা বর্ণনা করতেন আর শাহাদাতের অমিয় সুধা পানের তরঙ্গময় তামান্না করতেন তাই নয়; বরং নিজে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতেন। নেতৃত্ব দিতেন। বিস্মরকর যত্ন, সতর্কতা ও নৈপুণ্যতার সাথে পরিচালনা করতেন রণক্ষেত্র। যুদ্ধ কখনো ভয়াবহরূপ ধারণ করলে শত্রুর সবচে নিকটতম স্থানে অবস্থান করতেন।*[৩১] এভাবে সাতাশটি জিহাদের সরাসরি নেতৃত্ব দিয়েছেন।*[৩২]

আক্রমণাত্মক জিহাদই প্রকৃত জিহাদ ঃ পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফে জিহাদের যে অসীম মর্যাদা ও গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে এর মূল লক্ষ্য হলো ইকদামী ও আক্রমণাত্মক জিহাদ। কারণ, আত্মরক্ষামূলক জিহাদ তো সাধারণ দৃষ্টিতেও কোন মর্যাদার বিষয় নয়। এমনকি এটা শুধুমাত্র মানুষের স্বভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নিজের জীবন, অধিকার ও সম্ভ্রমরক্ষা করার জন্য হিংস্র ও চতুষ্পদ জন্তুও সংগ্রাম করে। কিন্তু নিজস্ব সভ্যতার প্রতিষ্ঠা, সত্যের প্রসার ও সর্বোপরি আল্লাহ'র দীনকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে সংগ্রাম করা এটা মানুষ ছাড়া অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

তাই ইসলামের নিরাপদ চর্চা, আল্লাহ'র দেয়া জীবন বিধানের মর্যাদাময় প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহ'র অনুগত বান্দাদের নিজস্ব বিশ্বাসদীপ্ত জীবন যাপনে ও তাদের স্বাধীনতার হুমকি কিংবা আশংকা অনুভূত হলেই ইসলাম মুসলমানগণকে শত্রুর বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী জিহাদের আদেশ দিয়েছে। "ফিৎনা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে আল্লাহ'র দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই কর" এর মর্মাবাণী এটাই।

কারণ, এটা কোন বুদ্ধিমানের কথা নয় যে, শত্রুপক্ষ থেকে আশঙ্কা দেখা দেয়ার পর তাদের পক্ষ থেকে আক্রমণের অপেক্ষা করতে হবে। তারা প্রথমে আক্রমণ করলে তারপরই প্রতিরক্ষার জন্য অস্ত্র ধরতে হবে। এর উপমা এমন, কারও সামনে সাপ কিংবা বাঘ পড়ল। তাহলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এটাই হবে, সাপ তার ফণা তোলার আগেই তাকে পিষে ফেলা এবং বাঘ আক্রমণ করার পূর্বেই তাকে শেষ করে দেয়া। সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে সাপ ও ব্যাঘ্র হামলা করার

পর তাকে প্রতিহত করা যেমন বোকামি, শত্রুপক্ষ থেকে আশঙ্কা অনুমিত হবার পরও তাদেরকে প্রথমে হামলা কার সুযোগ দেয়া প্রচণ্ড বোকামি ছাড়া আর কি হতে পারে।*৩৩

সুতরাং ইসলামের পরিষ্কার বিধান এটাই, ফিৎনা- অর্থাৎ কুফ্‌র ও শিরক কর্তৃক ইসলামী জীবনবোধ বিপর্যস্ত হবার আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে ধর্মজীবনে সার্বিক নিরাপত্তা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। আর এই নিরাপত্তা অর্জিত হতে পারে তিনভাবে। যথা—

এক. কাফির সম্প্রদায় আত্মসমর্পণপূর্বক হয় টেক্স দিয়ে অধীনস্ততা মেনে নেবে অথবা মুসলমানদের দাসত্ব স্বীকার করে নিবে।

দুই. কাফিরদের সাথে কোন শান্তিপূর্ণ চুক্তি সম্পাদিত হবে।

তিন. কাফির সম্প্রদায় মুসলমানদের কাছে নিরাপত্তা গ্রহণপূর্বক সাধারণ প্রজা হিসেবে জীবনযাপন করবে।

বলাবাহুল্য, এই তিন প্রকারের শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার বৈধতা ইসলামে নেই। এর বাইরে যারা আছে তারাই ইসলাম ও মুসলমানের জন্য সার্বক্ষণিক আশংকা বিষয়। যুদ্ধ তাদের বিরুদ্ধেই!*৩৪

প্রিয় নবীজীর দৃষ্টিতে মুজাহিদের মর্যাদা

প্রিয় নবীজী (সা.) অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় উচ্চারণ করেছেন–

وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ -

‘জেনে রেখো! বেহেশত হলো (মুজাহিদের) তলোয়ারের ছায়া তলে।*৩৫ অন্য একটি বর্ণনায় আছে, সাহাবী হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে রাসূল! আমি যদি নিহত হই (যুদ্ধে) তাহলে কোথায় থাকব? রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তর দিলেন ঃ বেহেশ্‌তে! একথা শুনে তিনি তার হাতের খেজুরগুলো দূরে ফেলে দিয়ে জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।*৩৬

আরেকটি হাদীসে আছে, একবার আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)কে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন ঃ হে আবূ সাঈদ! যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব ইসলামকে দীন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছে তার জন্য বেহেশত অনিবার্য হয়ে গেছে। একথা শুনে হযরত আবূ সাঈদ তাজ্জব হয়ে আরয করলেন ঃ হে রাসূল! কথাটা আবার বলুন!! রাসূলুল্লাহ (সা.) কথাটা আবার বললেন, সাথে এও বললেন ঃ আরেকটি আমল আছে, যার দ্বারা বান্দা বেহেশতে শতস্তরে উন্নীত হবে। আর প্রতি দুই স্তরের মাঝের ব্যবধান হবে আকাশ-পাতালের ব্যবধানের সমান। হযরত আবূ সাঈদ (রা.) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেই আমলটি কি? রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন– আল্লাহ’র রাস্তায় জিহাদ করা, আল্লাহ’র রাস্তায় জিহাদ করা।*৩৭

হ্যাঁ, যাঁরা আল্লাহ'র পথে সংগ্রাম করে জীবন বিলায় তাঁরা তো বেহেশতের শততম স্তরে সমাসীন হবেনই। কারণ, স্বয়ং বেহেশতের মালিকই তো তাদের প্রতি স্বীয় ভালোবাসার কথা ঘোষণা করেছেন, আর ভালোবাসার জনদেরকে সর্বোচ্চ মর্যদায় ভূষিত করবেন না, তো মর্যাদা দেবেন কাকে? ইরশাদ হয়েছে–

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ -

যাঁরা আল্লাহ'র পথে শীসাঢালা প্রাচীরের মত সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করেন আল্লাহ নিশ্চয় তাদেরকে ভালোবাসেন।*৩৮

আল্লাহর পথে যাঁরা শহীদ হন তাঁরা অমর

আল্লাহর এই প্রিয় বান্দার দল যারা তাঁরই পথে সারিবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করে তাঁর দ্বীনের পতাকাকে সকল কিছুর উর্ধ্বে তুলে ধরার লক্ষ্যে মহান মনিবের দরবারে তাদের মর্যাদা অসীম। বাহ্যত তাঁরা মারা গেলেও অমর হয়ে যান মালিকের দরবারে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ * بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ -

যাঁরা আল্লাহ'র পথে নিহত হয় তাদরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত। তবে তোমরা তা টের পাও না।*৩৯

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا - بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ - فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ -

'আর যাঁরা আল্লাহ'র পথে মরণ বরণ করে তাদেরকে মৃত মনে করো না। বরং তাঁরা জীবিত তাদের প্রভুর কাছে– সেখানে তাদেরকে রিযিক দেয়া হয়। (এবং) তারা তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অনুগ্রহে আনন্দিত।'*৪০

প্রকৃত অর্থে আনন্দিত হবার কথা তো তাঁদেরই। কারণ, তাঁরা মনিবের দেয়া জীবনসর্বস্ব মনিবের দেয়া জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠায় পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পেরেছেন। এই জীবন, এই জীবন সামগ্রী যাঁর দেয়া আমানত ছিল তাঁদের কাছে তাঁরা সে আমানত যথাযথ কাজে লাগাতে পেরেছেন, বিলিয়ে দিতে পেরেছেন ধমনীর সবক'টি রক্তকণিকা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আলোকময় কামনায়।

সতর্ক সংকেত! ঃ এটা সত্য, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছে করলে কোনরূপ রক্তক্ষয় ছাড়া পবিত্র ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত করতে পারতেন। নত-সমর্পিত করতে পারতেন ইসলামের সকল দুশমনকে ইসলামের সামনে

রক্তপাত ছাড়াই। অথচ তিনি এই ইসলামের স্বার্থে তাঁর সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি, প্রিয় বন্ধু হযরত (সা.)-এর পবিত্র বদন মুবারক পর্যন্ত রক্তাক্ত করেছেন। নবীজীর রক্তাক্ত বদন দাঁত ও বিদীর্ণ মস্তকের বিনিময়ে দিয়েছেন ইসলামের জয়; মহান বিজয়। কারণ, এটা আল্লাহ'র নিয়ম। এই মাটির পৃথিবীতে অনাবাদী এই মর্তলোকে ঈমানের চাষ করতে হলে প্রথমে তাকে হাল-চাষ করতে হয়। শিরক ও কুফুরীর ভয়াল জঙ্গল পরিষ্কার করতে হয় প্রথমে। আয়োজন করতে হয় জিহাদের-রক্তপাতের। অতঃপর কাফের-বেঈমানদের বিষাক্ত খুনের সার দিয়ে উর্বর বীর্জময় করে তুলতে হয় বিশাল মৃত্তিকাকে। অতঃপর সেই উর্বর জমিতে বপন করা হয় নবী-রাসূল, মুমিন-মুসলমানদের রক্তে নিহিত ঈমানের বীজ। ধীরে ধীরে সেই বীজ থেকে গজিয়ে উঠে ঈমান ইসলামের সবুজ বৃক্ষ। পৃথিবী হয়ে উঠে সবুজ-সুন্দর। যুগে যুগে এই ভূ-মৃত্তিকাকে এভাবেই আবাদ করেছেন মহান মালিক। অধিকন্তু হযরত রাসূল (সা.) ঘোষণা দিয়েছেন– এই পদ্ধতিতেই কিয়ামত পর্যন্ত আবাদ করা হবে এই পৃথিবীকে। এবং আল্লাহ'র জমিনে বসবাসকারী তার অনুগত কৃতজ্ঞ ভাগ্যবান বান্দাগণই পালন করবে পৃথিবী আবাদ করার এই দায়িত্ব। নবীজী (সা.) বলেন–

عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَبْرَحَ هٰذَا الدِّيْنُ قَائِمًا قَاتَلَ عَلَيْهِ عَصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ -

"এ দীন সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। মুসলমানদের একটি জামাত কিয়ামত পর্যন্ত এর সংরক্ষণের জন্য লড়াই করতে থাকবে।"*[৪১] অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত মুসরমানগণের একটি দল পৃথিবীর কোথাও না কোথাও সশস্ত্র সংগ্রাম রত থাকবে। এই থাকাটা তাঁদের জন্য মহান সৌভাগ্যের বিষয় আবার অনিবার্য কর্তব্যও। কারণ, মনিবের জমিনে বসবাস করবে আর তার আবাদ কর্মে সচেষ্ট হবে না– এর চেয়ে বড় অবাধ্যতা ও দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে!

এই সরলসত্য বাস্তবতা উপলব্ধি করার পরও যারা ঝঞ্ঝাটহীন, নিরাপদ, আয়েশী জীবনের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়; প্রিয় নবীজীর উম্মত হয়েও তাঁর জিহাদতপ্ত জীবনের অংশীদারি হয় না, নজীবী (সা.) তাদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন ঃ

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

'যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল, জীবনে কখনো জিহাদে অংশ গ্রহণ করেনি এবং তার অন্তরে কোন দিন জিহাদের কামনাও জাগেনি সে এক প্রকার মুনাফেকির ওপরই মারা গেল।*[৪২] এখানেই কি শেষ! রাসূল (সা.) আরও বলেছেন ঃ "যখন তোমরা সুদী কেনা-কাটা করতে শুরু করবে, গরুর লেজুর ধরে থাকবে, ক্ষেত-খামার নিয়ে আকণ্ঠ ডুবে থাকবে আর আল্লাহর পথে জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তোমাদেরকে অপমানের এমন বোঝা চাপিয়ে দেবেন, পরিপূর্ণভাবে ইসলামের ভেতর ফিরে না আসা পর্যন্ত তা আর সরানো হবে না।"[৪৩] অন্য একটি বর্ণনায় আছে– 'একদিন রাসূল (সা.) ইরশাদ করলেন ঃ খুব শিগগিরই তোমাদের ওপর বিভিন্ন জাতি এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে, যেভাবে ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাবার পাত্রের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরয করলেন ঃ সে দিন কি আমরা সংখ্যায় খুব কম হবো? নবীজী (সা.) বললেন ঃ না, সংখ্যায় তোমরা অনেক হবে। তবে তোমরা হবে সয়লাবসৃষ্ট ফেনা পুঞ্জের মত। আল্লাহ তোমাদের শত্রুর অন্তর থেকে তোমাদের ভয় তুলে নেবেন, আর তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দেবেন 'ওয়াহান'। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ওয়াহান কী? রাসূল (সা.) বললেন ঃ ওয়াহান হলো– দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা আর মৃত্যুর প্রতি অনীহা-অনাগ্রহ ও ঘৃণা।*[৪৪]

একবিংশ শতাব্দীর প্রভাতলগ্নে দাঁড়িয়ে আজ যদি আমরা এই শেষোক্ত হাদীস দু'টির আলোকে আমাদের আবিশ্ব পরিস্থিতি বিচার করি তাহলে একথাই প্রতিভাত হবে, কোটি কোটি সদস্যে সমৃদ্ধ বিশ্ব মুসলিম পরিবার আজ সত্যিই তার শত্রুদের চোখে জলতরঙ্গসৃষ্ট ফেনা পুঞ্জের মতোই। এবং এর একমাত্র কারণ সশস্ত্র যুদ্ধবর্জন। বেহেশতের লাল গালিচা বিছানো পথ 'আল-জিহাদ'কে বর্জনের ফলেই আজ সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের কাধে চেপে বসেছে অপমান ও লাঞ্ছনার আকাশসম বোঝা। দুনিয়ার মোহ আর মৃত্যুভয়ে পুরো মিল্লাত আজ কম্পমান; দানব হিংস্র শত্রুদের প্রতি নতজানু-আজ্ঞাবহ। ভয়ংকর এই গ্লানি, অপমান ও তমসাচ্ছন্ন জীবন থেকে পরিত্রাণের পথ মাত্র একটি– 'জিহাদ'। নবীজীর (সা.) নেতৃত্বে জিহাদের যে রক্তিম আভায় আলোকিত করে তুলেছিলেন সাহাবায়ে কেরাম ইতিহাসের সর্বজন স্বীকৃত অন্ধ যমানাকে, আজ প্রয়োজন সেই জিহাদী আলোর—বুকের তাজা খুন দিয়ে প্রজ্বলিত হবে যে আলোক শিখা!!

তথ্যসূত্র

১. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, মাওলানা তকী উসমানী, ৩য় খণ্ড, ৩য় পৃ.
২. বাকারা ঃ ১৫৪
৩. মুসলিম শরীফ, হযরত জাবির (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস।
৪. সীরাতুল মুস্তফা, মাওলানা ইদরিস কান্ধালবী (রহ.), ২য় খণ্ড, ১-২ পৃ.
৫. প্রাগুক্ত
৬. প্রাগুক্ত
৭. প্রাগুক্ত
৮. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৩য় খণ্ড, ৩-৪ পৃ. রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ'র দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করে সেই আল্লাহর পথের মুজাহিদ। বুখারী, মুসলিম।
৯. তাকমিলা, সীরাতুল মুস্তফা, ২য় খন্ড, ২৪ পৃ.
১০. সীরাতুল মুস্তফা, ১৫ পৃ.
১১. আশরাফুল জওয়াব, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) প্রথম খণ্ড, ১২ পৃ. দীন ও শরীয়ত, মাওলানা মনযূর নু'মানী, ১৯৬ পৃ.
১২. তাকমিলা, ৫ পৃ.
১৩. সীরাতুল মুস্তফা, ৪৪ পৃ.
১৪. আন-নাবিয়্যুল খাতাম, মাওলানা সায়্যিদ মানাযির আহসান গিলানী (রহ.) ১৩৭-১৩৮ পৃ. অবশ্য মাওলানা সুলায়মান মুনসূরপুরী তাঁর প্র খ্যা ত সী রা ত গ্র ন্থ 'রাহমাতুল-লিল-আলামীন'এ বলেছেন, এই সংখ্যা ১০১৮ জন। দেখুন– দস্তরে হায়াত, মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.), ১৫৬ পৃ.
১৫. আননাবিয়্যুল খাতাম
১৬. আম্বিয়া ঃ ১০৭
১৭. হজ ঃ ৩৯, ৪০
১৮. রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ আমাকে এই সময় ক্ষমার নীতি অবলম্বনের আদেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ো না। নাসায়ীর সূত্রে তাকমিলা, ৩/৬ পৃ.
১৯. তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৫ম খণ্ড, ৪৩ পৃ.
২০. টীকা, সীরাতুল-মুস্তাফা, ১০ পৃ.
২১. প্রাগুক্ত
২২. বাকারা ঃ ১৯০
২৩. তাকমিলা, ৬ পৃ.
২৪. প্রাগুক্ত
২৫. তাওবা ঃ ৫
২৬. তাওবা ঃ ২৯
২৭. আনফাল ঃ ৩৯
২৮. বুখারী, মুসলিম, জিহাদের চল্লিশ হাদীস, সংকলন, মাওলানা আবদুস সামাদ সাইয়াল, অনুবাদ ঃ মুফতী আবূ সাঈদ, পৃ. ৩৩
২৯. দস্তূরে হায়াত, মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, ১৫৫ পৃ.
৩০. তিরমিযী, জিহাদের চল্লিশ হাদীস, ৯ পৃ.
৩১. দস্তূরে হায়াত, ১৫৫
৩২. প্রাগুক্ত
৩৩. সীরাতুল-মুস্তাফা, ২৩-২৪ পৃ.
৩৪. প্রাগুক্ত
৩৫. রিয়াযুস-সালিহীন, ৩৭ পৃ. বাবুস-সবর, ৫৩ পৃ. বুখারী, মুসলিম
৩৬. মুসলিম, জিহাদের চল্লিশ হাদীস, ৪৪
৩৭. মুসলিম প্রাগুক্ত
৩৮. সূরাতুস-সফ ঃ ৪
৩৯. বাকারা ঃ ১৫৪
৪০. আলে ইমরান ঃ ১৬৯-১৭০
৪১. চল্লিশ হাদীস ঃ ১৭
৪২. প্রাগুক্ত, মুসলিম
৪৩. আবূ দাউদ
৪৪. আবূ দাউদ, দস্তূরে হায়াত, ১৫৮-১৬৯ পৃ.।

লাল বর্ণের গদ্য ঃ জি হা দ

মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

প্রকাশক
আরিফ বিল্লাহ
এদারায়ে কুরআন
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ঃ ২০০২ ইংরেজী

প্রচ্ছদ
নাজমুল হায়দার

মূল্য ঃ ষাট টাকা মাত্র

ISBN :984-600-006-5

এদারায়ে কুরআন
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

ISBN. 984-600-006-5